Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রাসুলের সিরাত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মরিয়ম খাতুন

রোলঃ 23090121066

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রাসুলের সিরাত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মরিয়ম খাতুন

রোলঃ 23090121066

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " রাসুলের সিরাত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মরিয়ম খাতুন, আইডিঃ 23090121066 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " রাসুলের সিরাত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Mariom

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

মরিয়ম খাতুন

আইডিঃ 23090121066

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

নবীর পরিবার পরম্পরা.....7

যমযম কূপ খনন.....8

হস্তী বাহিনীর ঘটনা.....8

অধিক সংখ্যক চরিত্র বেতাগণের অভিমত হচ্ছে এ ঘটনার সংগঠিত হয়েছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু সালামের জন্ম লাভের মাত্র ৫০ কিংবা ৫৫ দিন পূর্বে মুহার্‌রম মাসে। এ প্রেক্ষিতে এটা ধরে নেওয়া যায় যে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষভাগে কিংবা মার্চ মাসে প্রথম ভাগে। হস্তীবাহিনীর এ ঘটনা ছিল আগামী দিনের নবী সাল্লাল্লাহু সাল্লাম এবং কাবা শরীফের জন্য আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও সাহায্যের একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন। 10

আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান-সন্ততি 10

জন্ম.....10

শিশু মুহাম্মদ.....11

বক্ষ বিদারণ.....12

মা ও দাদার ইন্তেকাল আবু তালিবের অভিভাবকত্ব.....12

ফিজার ও হিলফুল ফুযুলে এ অংশগ্রহণ.....13

মা খাদিজার বিয়ে.....13

রাসুল স: এর সন্তানাদি.....14

কা'বা সংস্কার এবং হাজরে আসওয়াদ স্থাপন.....14

নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বকালীন মুহাম্মদ.....14

হেরা গুহায় ধ্যান ও প্রথম ওহী আগমন.....15

প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত.....19

কুরাইশ কর্তৃক মুসলিম নির্যাতন.....21

আবিসিনিয়ায় মুসলমানদের হিজরত..23
হামযাহ (রা:) এর ইসলাম গ্রহণ...23
উমার (রা:) এর ইসলাম গ্রহণ..24
সর্বাত্মক বয়কট এবং অঙ্গীকারনামা বিনষ্ট 28
আবু তালিব ও হযরত খাদিজা রাঃ এর ইনতেকাল..31
সাওদা রা: এর সাথে রাসুল স: এর বিয়ে 32
তায়েফে রাসুল (সাঃ) এর দাওয়াত..32
রাসুল (সাঃ) এর মেরাজ 33
বায়আতে আক্বাবাহ..34
রাসুল স: এর মদিনায় হিজরত..35
বদরের যুদ্ধ...45
ওহুদের যুদ্ধ 45
খন্দকের যুদ্ধ 46
ইফকের ঘটনা..46
হুদায়বিয়ার সন্ধি...47
খায়বর যুদ্ধ 48
রাসুল স: কে বিষ মিশ্রিত মাংস খাওয়ানোর ঘটনা..48
মুতার যুদ্ধ...49
মক্কা বিজয়...49
বিদায় হজ...50
রাসুল স: এর মৃত্যু 53
শোকের ছায়া 53

নবীর পরিবার পরম্পরা

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম) তৎকালীন আরবের মক্কার কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তার পরিবার হাশেমী পরিবার নামে প্রসিদ্ধ ছিল। হাশিম ছিলো নবী কারিম (সাঃ) এর প্রপিতামহ। হাশিম ছিলো অত্যন্ত সম্মানিত ও সম্রান্ত ব্যক্তিত্ব। তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি 'শোরবা' বা ঝোলের সঙ্গে রুটি মিশ্রিত করে মক্কায় হজ্জযাত্রীগণকে খাওয়ানোর বন্দোবস্ত করেন। তার আসল নাম ছিল অমর। কিন্তু স্বর বা ঝোলের সঙ্গে রুটি ভেঙ্গে মিশ্রিত করার কারণে হাশিম নামের তাকে ডাকা হয়ে থাকে। একদা তিনি ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে শাম রাজ্যে যাওয়ার পথে মদিনায় পৌছালেন তখন সেখানে বনু 'আদী বিন নাজ্জার গোত্রের সালমা বিনতে 'আমর নাম্নী এক মহিলা কে বিবাহ করেন এবংকিছুকাল সেখানে অবস্থান করেন। তারপর সেই স্ত্রীকে গর্ভবতী অবস্থায় তার পিত্রালয়ে রেখে দিয়ে তিনি শাম রাজ্যে চলে যান এবং সেখানে গিয়ে ফিলিস্তিনদের গাযাহ শহরে পরলোক গমন করেন।

৪৯৭খ্রিস্টাব্দে সালমার গর্ভজাত সন্তান ভূমিষ্ঠ হন। শিশু বালকের মাথার চুল সাদা তাই সালমা তার নাম রাখেন শায়বাহ। মক্কার হাশেম পরিবারের কেউই তার জন্মের কথা জানতো না।যখন সায়বার বয়স ৭-৮ বছর উপনীত হন তখন মুত্তালিব তার সম্পর্কে অবগত হন। মুত্তালিব সায়বাহকে নেয়ার জন্য ইয়াসরিব গমন করেন। সায়বাহ তার মাথার অনুমতি বাতিরেখে মক্কাতে যেতে অস্বীকার করায় তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মুত্তালিব তার মাথার নিকট অনুমতি প্রার্থী হন। তার মাথা তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলে মুত্তালিব তাকে একথা বুঝিয়ে বলেন যে, এ' ছেলে তার পিতার রাজত্বে এবং আল্লাহর হারাম শরীফের দিকে যাচ্ছেন এ নিশ্চিত রুপে চরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। তারপর সায়বাহকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা অনুমতি প্রদান করেন। মুত্তালিব যখন তাকে উটের পিঠে বসিয়ে মক্কায় নিয়ে আসেন তখন বালকটিকে মুত্তালিবের পাশে দেখে মক্কাবাসীগণ বলেন যে এ হচ্ছে আব্দুল মুত্তালিব অর্থাৎ মুত্তালিবের দাস। তদুত্তরে মুত্তালিব বলেন 'না না, এ হচ্ছে আমার ভাতুষ্পুত্র আমার ভাই হাশিমের ছেলে।
শায়বাহ যখন যোবনে পদার্পণ করেন তখন কোন একসময় ইয়ামানের দাম্মানে মুত্তালিব পরলোকগমন করেন। মুত্তালিবের মৃত্যুর পর আব্দুল মুত্তালিব পরিত্যক্ত পদ সমূহের অধিকার লাভ করে। কালক্রমে আব্দুল মুত্তালিব নিজ সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বেশি মান-মর্যাদা লাভ করেন।

যমযম কূপ খনন

একদা আব্দুল মুত্তালিব স্বপ্নযোগে অবগত হন যে তাকে যমযম কূপ খননের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে এবং স্বপ্নযোগে তার স্থান নির্দিষ্ট করা দেওয়া হচ্ছে। তারপর ঘুম থেকে জেগে তিনি করন কাজ আরম্ভ করে দেন এবং খনন কাজ চলাকালে কূপ থেকে অনেক জিনিসপত্র উত্তোলন করেন যা জুরহুম গোত্র মক্কা ছেড়ে যালা নামক স্থানে যাওয়ার প্রাক্কালে কুপের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলেন। তার মধ্যে ছিলো কিছু সংখ্যক তলোয়ার, লৌহবর্ম এবং দুটি সোনার হরিণ।আব্দুল মুত্তালিব তলেয়ার দ্বারা কা'বাহ গৃহের দরজা ঢালাই করে দেন এবং সোনার হরিণ দুটি দরজার সঙ্গে সন্নিবেশিত করে রাখেন এবং হজ্জযাত্রীগণকে পানি পান করার ব্যবস্থা করেন। খনন কাজ চলাকালে কুরাইশগণ আব্দুল মুত্তালিব এর সঙ্গে বিবাদ আরম্ভ করেন এবং দাবি করেন যে খনন কাজে তারাও অংশগ্রহণ করবে। আব্দুল মুত্তালিব বলেন কূপ খননের জন্য তিনি স্বপ্নযোগে আদিষ্ট হয়েছেন সেহেতু খনন কাজে অন্য কাউকে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া সম্ভব না।কিন্তু কুরাইশরা ও ছারবার পাত্র নয় এ ব্যাপারে মতামত গ্রহণের জন্য তারা বনু সা’দ হুযাইম গোত্রের এক মহিলার ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং মক্কা থেকে যাত্রা শুরু করেন কিন্তু পতিমধ্যে তাদের পানি শেষ হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা আব্দুল মুত্তালিব এর উপর বৃষ্টি বর্ষণ করে তার পানির ব্যবস্থা করলেন কিন্তু তিনি ছাড়া আর কার ও উপর এক ফোঁটাও বৃষ্টি বর্ষিত হলো না এমন বিরল নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার   ফলে তাদের নিকট এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা যমযম কূপ খননের কাজ আব্দুল মুত্তালিবের জন্যই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তাই তারা মক্কায় ফিরে গেলেন।

হস্তী বাহিনীর ঘটনা

ইয়েমেনের গভর্নর আবরাহা বিন সাবাহ হাবশী যখন দেখলেন যে, আরব বাসিগণ কাবাগৃহে হজব্রত পালন করছেন এবং একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ থেকে লোকজন সেখানে আগমন করছেন তখন সনআয় একটি গির্জা নির্মাণ করলেন এবং আরব বাসিগণের হজ্জব্রতকে সেদিকে ফিরিয়ে আনার জন্য আহ্বান জানালেন। কিন্তু বনু কিনা না গোত্রের এক ব্যক্তি যখনই সংবাদ অবগত হলেন তখন এক রাত্রে তিনি গোপনে গির্জায় প্রবেশ করে তার সামনের দিকে মলের প্রলেপন দিয়ে একদম নোংরা করে ফেললেন এ ঘটনায় আব্রাহা ভয়ানক ক্রোধান্বিত হন এবং প্রতিশোধ গ্রহণ কল্লে কাবা গৃহ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে অস্ত্র সজ্জিত সৈন্যের এক বিশাল বাহিনীর অগ্রসর হন তিনি নিজে একটি

শক্তিশালী হস্তি পৃষ্ঠে আরোহণ করেন। সৈন্যদের নিকট মোট নয়টি অথবা ১৩ টি হস্তি ছিল। আবরাহা ইয়েমেন থেকে অগ্রসর হয়ে মুগাম্মাস নামে স্থানে পৌছালেন এবং সেখান থেকে সৈন্য বাহিনী প্রস্তুত করে মক্কায় প্রবেশের জন্য অগ্রসর হলেন। আবরাহা আরবের সীমান্ত পর্যন্ত পৌছালো। সেখানে একটি চারণভূমিতে কিছু মেষ এবং উট চরছিলো। আবরাহা সেগুলো দখল করে নেয়। এই মেষ এবং উট গুলো ছিলো রাসূল (সাঃ) এর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের।আব্দুল মুত্তালিব আবরাহার কাছে গেলেন। নুফাইলকে বললেন আবরাহার সাথে দেখে করতে এসেছেন। নুফাইল উনায়িচের সাথে কথা বলে আবরারাহার সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করে দিলেন। আবরাহা আব্দুল মুত্তালিবের সাথে দেখা করেন এবং তাকে সাদরে গ্রহণ করে নেন। আবরাহা দোভাষীর মাধ্যমে জানতে চাইলে তিনি কি চান। আব্দুল মুত্তালিব কোনো রাখঢাক না রেখে বললেন আবরাহা আমার দুইশত উট লুট করেছে আমি তা ফেরত চাই। উত্তরে আবরাহা বলল প্রথম দেখায় তোমার প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়েছিল তা নষ্ট হয়ে গেছে আমি এসেছি তোমার এবং তোমার পূর্বপুরুষদের লাঞ্ছিত করতে,তোমাদের দেশ ধ্বংস করতে আমি তোমাদের পূর্বপুরুষদের তৈরি কা’বা ভেঙে দিতে চাই । আর তুমি কিনা এসেছো আমার কাছে উট চাইতে! আব্দুল মুত্তালিব বললেন উটের মালিক আমি তাই আমি উট নিতে এসেছি আর কা’বা ঘরের মালিক স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাই আল্লাহ এই ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। আবরাহা আব্দুল মুত্তালিব এর উট ফেরত দেওয়া নির্দেশ দিলেন ।আব্দুল মুত্তালিব উট নিয়ে মক্কায় ফিরে গেলেন আর তার গো্ত্রের লোকদের বললেন আবরাহার সাথে যুদ্ধ করোনা মক্কা থেকে পালিয়ে যাও। সবাই মক্কা ছেড়ে পাহাড়ে অবস্থান নেয়।সবার শেষে আব্দুল মুত্তালিব কা’বা ত্যাগ করেন। যাওয়ার সময় কাবার চাদর মড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহর নিকট দোয়া করেন যেন আল্লাহ তাআলা তার ঘরকে রক্ষা করেন। আবরাহা যখন মজুদালিফাহ এবং মিনার মধ্যবর্তী স্থান ওয়াদিয়ে মুহাসসিরে পৌছালেন তখন তার হাতি মাটিতে বসে পড়ল। কাবা অগ্রসর হওয়ার জন্য কোনক্রমেই তাকে উঠানো সম্ভব হলো না, অথচ উত্তর ও দক্ষিণ কিংবা পূর্ব মুখে যাওয়ার জন্য উঠানোর চেষ্টা করলে তা তৎক্ষণাৎ উঠে দৌড়াতে শুরু করত। এমন সময় আল্লাহ তা'আলা এক ঝাক ছোট ছোট পাখি প্রেরণ করলেন।সেই পাখিগুলো ঝাকে ঝাকে পাথরের ছোট ছোট টুকরো সৈন্যদের উপর নিক্ষেপ করতে লাগলো। প্রত্যেকটি পাখি তিনটি করে পাথরের টুকরো নিয়ে আসতো একটি ঠোঁটে এবং দুটি দুপায়ে। কঙ্কর গুলোর আকার আয়োতন ছিল ছোলার মত কিন্তু কঙ্কর গুলো যার যে অঙ্গে লাগতো সে অঙ্গ ফেটে গিয়ে সেখান দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হতে হতে সে মারা যেত। এই অলৌকিক ঘটনায় সকলেই ভীষণভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়লএবং প্রাণ ভয়ে পালানোর উদ্দেশ্যে যখন বেপরোয়া ভাবে ছোটাছুটি শুরু করলে পদদলে পিষ্টি হয়ে অনেকেই প্রাণ

ত্যাগ করলো। এদিকে আবরাহার উপর আল্লাহ তায়ালা এমন মুসিবত প্রেরণ করলেন যে তার আঙ্গুলসময়ের জোড় খুলে গেল এবং সনআ নামক স্থানে যেতে না যেতেই তিনি পাখির বাচ্চার মত হয়ে পড়লেন তারপর তার বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে হৃদপিণ্ড বেরিয়ে এলো এবং তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হলেন

অধিক সংখ্যক চরিত্র বেতাগণের অভিমত হচ্ছে এ ঘটনার সংগঠিত হয়েছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু সালামের জন্ম লাভের মাত্র ৫০ কিংবা ৫৫ দিন পূর্বে মুহার্রম মাসে। এ প্রেক্ষিতে এটা ধরে নেওয়া যায় যে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষভাগে কিংবা মার্চ মাসে প্রথম ভাগে। হস্তীবাহিনীর এ ঘটনা ছিল আগামী দিনের নবী সাল্লাল্লাহু সাল্লাম এবং কাবা শরীফের জন্য আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও সাহায্যের একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন।

আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান-সন্ততি

আব্দুল মুত্তালিবের ছিল সর্বমোট দশটি সন্তান। তাদের নাম যথাক্রমে : হারিস, জুবাইর, আবু তালেব, আব্দুল্লাহ, হামজা, আবু লাহাব, গায়দাক্ক মুক্কাবভিম, যেরার, এবং আব্বাস। কেউ কেউ বলেছেন তার ছিল ১১ টি সন্তান একজনের নাম ছিল কুসাম। অন্য কেউ বলেছেন যে ১৩ টি সন্তান ছিল অন্য দুজনের নাম আব্দুল কা'বাহ এবং হাফ্স। আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা ছিল ৬জন তাদের নামগুলো হচ্ছে যথাক্রমে -উম্মুল হাকিম, বাররাহ, আতিকাহ, সাফিয়াহ, আরওয়া এবং উমাইয়া।

জন্ম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৯ই রবিউল আউয়াল(ফীলের বছর) সোমবার দিবস রজনীর মহা সন্দীক্ষণের সুবহে সাদিকের সময় জন্ম লাভ করেন। ইংরেজি পঞ্জিকা মতে তারিখটি ছিল ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ ২০ শে অথবা ২২ শেএপ্রিল। ইবনু সা'দ হতে বর্ণিত হয়েছে যে -রাসুলুল্লাহ (সা:) এর মা বলেছেন যখন তার জন্ম হয়েছিল তখন আমার শরীর হতে এক জ্যোতি বের হয়েছিল যাতে শ্যাম দেশের অট্টালিকা সমূহ আলোকিত হয়েছিল। সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার পর পরে বিবি আমিনা আব্দুল মুত্তালিবের নিকট তার পুত্রের জন্মগ্রহণের শুভ সংবাদটি প্রেরণ করেন। পুত্রের জন্ম লাভের খবর পেয়ে তিনি ঘরে ছুটে আসেন এবং শিশু মহানবী(সাঃ) কে কা'বা ঘরে নিয়ে যান অতঃপর শিশুর জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া কামনা করেন। একান্ত আনন্দ মধুর এই মুহূর্তে তিনি এ নবজাতকের নাম

স্থির করেন মোহাম্মদ। তারপর আরবের প্রথা অনুযায়ি সপ্তম দিনে আকিকা করা হয়। শিশু মুহাম্মদ জন্মের পূর্বেই তার বাবা মৃত্য বরণ করেন।

শিশু মুহাম্মদ

রাসুলুল্লাহ (সা:)জন্মের পর তার মায়ের দুধ পানের পাশাপাশি সুওয়াইবা এর দুধ পান করেন। সুওয়াইবা ছিলেন আবু লাহাবের দাসী। তৎকালীন সমাজের প্রথা অনুযায়ী শিশু মুহাম্মাদের লালন পালন এবং দুগ্ধ পানের দায়িত্ব পান বেদুইন ধাত্রী হালিমা। শহর নগরের জরাকীর্ণ পরিবেশ থেকে গ্রামীণ উন্মুক্ত পরিবেশে শিশুদের লালন পালনের মাধ্যমে যেন বলিষ্ঠ এবং মজবুত মাংশপেশীর অধিকারী হয় এবং বিশুদ্ধ আরবী ভাষা শিখতে পারে এজন্য বেদুইন ধাত্রী গণকে শিশু পালনের দায়িত্ব দেওয়া হতো। বিবি হালিমা এবং তার স্বামী তাদের দুগ্ধ পোষ্য সন্তানসহ বনু সা'দ গোত্রের মহিলাদের সাথে দুগ্ধ পান করাবেন এমন শিশুর সন্ধানে মক্কা যান। মুহাম্মদ (সা:)পিতৃহীন ইয়াতীম হওয়ায় তাকে কোনো বেদুইন মহিলা নিতে রাজী হলো না। ঘটনাক্রমে হালিমা সাদিয়া ও কোনো শিশু সংগ্রহ করতে পারলো না। অবশেষে হালিমা আমেনার আগ্রহাতিশয্যে শিশু মুহাম্মদকে গ্রহণে সম্মত হন এবং কোলে তুলে ঘরের উদ্দেশে রওয়ানা হন। তারপর হালীমাহ বলল যখন শিশু মুহাম্মদকে নিয়ে ঘরপ এলাম এবং তাকে কোলে রাখলাম তখন তিনি তার দু সীনা আমার বক্ষের সাথে মিলিত করে পূর্ণ পরিতৃপ্তির সাথে দুধ পান করলেন এমনকি তার দুধ ভাই ও পূর্ণ পরিতৃপ্তির সাথে দুধ পান করল। এরপর উভয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। এর পূর্বে তার এভাবে ঘুম আমরা কখনোই দেখিনি। অন্যদিকে হালীমার স্বামী উট দোহন করতে গিয়ে দেখেন ওলান দুধে পরিপূর্ণ। তিনি এত পরিমাণে দুধ দোহন করলেন যে তারা দুজনেই তৃপ্তি সহকারে পেট ভরে পান করলেন। রাত্রিযাপন শেষে যখন সকাল হলো হালীমার স্বামী বলল হালীমাহ তুমি একজন মহা ভাগ্যবান সন্তান লাভ করেছো। উত্তরে হালীমাহ বলল আল্লাহর শপথ অবস্থা দেখে আমার ও তাই মনে হচ্ছে। দু বছর পর হালীমাহ সাদিয়া শিশু মুহাম্মদকে মক্কায় নিয়ে আসেন এবং তার মায়ের হাতে তুলে দেন।এসময় মক্কায় মহামারী দেখা দিয়েছিলো। তাই শিশুর নিরাপত্তার স্বার্থে মা আমেনার আকাঙ্খার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আবার মুহাম্মদকে নিজের ঘরে ফিরে আনেন। হযরত হালিমা মুহাম্মদকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন।

বক্ষ বিদারণ

দুগ্ধ পানের সময়সীমা অতিক্রম হওয়ার পরেও বালক নবী বনু সা'দ গোত্রে অবস্থান করতে থাকেন।ইবনু ইসহাক্বের বর্ণনা মতে, দিত্বীয় দফায় হালীমার ঘরে অবস্থানকালে কয়েকমাস পর পক্ষান্তরে মুহাক্কিকগণের বর্ণনামতে জন্মের ৪র্থ কিংবা ৫ম বছরে বক্ষ বিদরণের ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি হচ্ছে একদা বালক নবী যখন তার সঙ্গী সাথীদের সাথে খেলছিলেন তখন জিবরাঈল (আ:)সেখানে উপস্থিত হন। তারপর তাকে একটু দুরে নিয়ে গিয়ে চিৎ করে শুয়ে দিয়ে তার বক্ষ বিদীর্ণ করে হৃৎপিন্ড বের করে আনলেন। তারপর তার মধ্যে জমে থাকা জমাট রক্ত দেখিয়ে বললেন এটা শয়তানের অংশ যা তোমার মধ্যে ছিলো। তারপর হৃৎপিন্ড সোনার তস্তুরিতে রেখে যমযম কূপের পানি দিয়ে ধুয়ে যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করে কাটা অংশ জোড়া লাগিয়ে দিলেন।এভাবে মহানবী (সা:) এর জীবনে চার মতান্তরে ২ বার বক্ষ বিদীর্ণের ঘটনা ঘটে।

মা ও দাদার ইন্তেকাল আবু তালিবের অভিভাবকত্ব

বয়স যখন ৬ বছর তখন মহানবী (সা:) মায়ের সাথে মদীনায় যান বাবার কবর জিয়ারত করতে ফেরার সময় **‘আবওয়া’** নামক স্হানে মা আমেনা ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই সমাহত হন। সফরে মহানবী (সা:) এর দাঈমা ও সাথে ছিলেন। তার সাথেই নবীজী (সা:) মক্কায় ফিরে আসেন। বয়স যখন ৭ বছর তিনি তার দাদা আব্দুল মুত্তালিবের সাথে বসবাস করছিলেন। একবছর পর ৮ বছর বয়সে নবী (সা:) এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব মারা যান। ৮-**১২** বছর বয়স পর্যন্ত চাচা আবু তালিবের অভিভাবকত্বে আস্তে আস্তে বড় হন আমাদের প্রিয় নবী (সা:)। **১২** বছর বয়সে চাচা আবু তালিবের সাথে ব্যবসায়িক কাজে সিরিয়া গমন করেন। সেখানে বুহায়রা নামক এক পাদ্রী বা ধর্মযাজক ছিলেন তিনি নবী (সা:) এর অবয়ব, আচরণ এবং অন্যাম্য বৈশিষ্ট্য দেখে বুঝতে পারেন যে, ইনিই হচ্ছেন বিশ্বমানবের মুক্তির দিশারী আখেরী নবী (সা:)। তারপর কিশোর নবী (সা:) এর হাত ধরে তিনি বলেন যে, ইনি হচ্ছেন বিশ্ব জাহানের সরদার। আল্লাহ তাকে বিশ্ব জাহানের রহমত রূপী রাসূল মনোনীত করবেন। পাদ্রী জানায় সে তার ধর্ম গ্রনহ বাইবেল থেকে এ বিষয়ে জানতে পারেন।

ফিজার ও হিলফুল ফুযুলে এ অংশগ্রহণ

বনু কায়েস এবং কুরাইশ গোত্রের মধ্যে ফিজার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। বনু কুরাইশ যেহেতু এই যুদ্ধের এক পক্ষ সে হিসেবে মহানবী (সা:) কে এই যুদ্ধে যোগদান করতে হয়।তবে তিনি কারো উপর হাত উঠান নি। রাসুলুল্লাহ (সা:) এর বয়স যখন আনুমানিক ২০ বছর তখন তিনি হিলফুল ফুযুলে যোগদান করেন।ফিজার যুদ্ধ শেষে কুরাইশ বিশিষ্ট গোত্রপতিগণ আব্দুল্লাহ বিন জুদ'আন তাঈমীর ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর নামে একটি অঙ্গীকারনামা সম্পাদনা করেন।আলোচনা শেষে সবাই এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয় যে,আমাদের মধ্যে সকলেই মজলুমের সাহায্য করব এবং মক্কার চতুস্শীমার মধ্যে কোনো যালিম অত্যাচারি থাকতে পারবেনা।মক্কার বাহিরে থেকে যারা মক্কায় আসেন তাদের ধন প্রাণ ও মান সম্মান রক্ষায় যথাসাধ্য চেষ্টা করব।রাসুলুল্লাহ (সা:) এ অঙ্গীকারের শরিক ছিলেন।এটা ছিলো অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারনামা।এজন্য অঙ্গীকারনামাকে হিলফুল ফুযুল অথবা হলফ উল ফুযুল বলে। তিনি তার নবুওয়াত যুগে বলতেন, সেই অঙ্গীকারের মোকাবেলায় কেউ যদি আমাকে লালরঙের উট ও দিতে চাইত তবুও এর বিনিময় করতাম না।আর আজ ও যদি কেউ সেই অঙ্গীকারের নামে আমাকে আহ্বান জানায় আমি সেই আহ্বানে সাড়া দিব।

মা খাদিজার বিয়ে

খাদিজা (রা:) ছিলেন তৎকালীন মক্কার অভিজাত বংশীয় এক বিরাট ধনবতী মহিলা।সিরিয়া থেকে যুবক নবী (সা:) এর প্রত্যাবর্তনের পর ব্যবসা বাণিজ্যের খতিয়ান করা হলো হিসাব নিকাশ করে আমানতসহ এত বেশী পরিমাণ অর্থ তিনি পেলেন ইতোপূর্বে কেনো দিনই তা পাননি।হযরত খাদিজা (রা:)এর দাস মায়সারা ছিলেন মহানবী (সা:)এর সফরসঙ্গী। মায়সারহর কাছ থেকে মহানবী (সা:)এর সত্যবাদিতা,মিষ্টভাষিতা,উন্নত চিন্তা ভাবনা,আমানত হেফাজত করার ব্যাপারে একাগ্রতা ইত্যাদি অবগত হওয়ার পর তিনি মহানবী (সা:)এর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নিজ থেকেই বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। প্রস্তাব অনুমোদন লাভ করেন এবং যথানিয়মেই এই বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

রাসুল স: এর সন্তানাদি

ইব্রাহিম ব্যাতিত সকল সন্তান খাদিজা রা: এর গর্ভজাত। তার প্রথম সন্তানের নাম কাসেম, তারপর জয়নব, রোকাইয়া, উম্মে কুলসুম, ফাতেমা এবং আব্দুল্লাহ। রাসুল স: সকল পুত্র শৈশবে মৃত্যুবরণ করেন। একমাত্র ফাতেমা রা: ব্যাতিত বাকি কন্যা সন্তান রাসুল স: এর জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন। ফাতেমা রা: তার পিতার মৃত্যুর ছয় মাস পরে মৃত্যুবরণ করেন।

কা'বা সংস্কার এবং হাজরে আসওয়াদ স্থাপন

মহানবী (সা:) এর বয়স যখন ৩৫ বছরে পদার্পণ করেন তখন কা'বা ঘরের পুর্ণনির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন। কা'বা ঘরের স্থানটি চতুর্দিকে দেওয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলো।গৃহটি বহু পূর্বে নির্মিত হওয়ার কারণে দেওয়ালগুলোতে ফাটল ধরে ভেঙ্গে পড়ার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো।এ অবস্থায় কুরাইশগণ সিদ্ধান্ত নেই কা'বা পুর্ণনির্মাণ করবে এবং তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে কা'বা নির্মাণ করা হবে শুধু বৈধ অর্থ দিয়ে। ওয়ালীদ বিন মুগীরাহ মাখযূমী সর্বপ্রথমে কা'বা ভাঙ্গার কাজে হাত দিলেন এবং আল্লাহকে বলেন, হে আল্লাহ! আমাদের ভালো ব্যাতীত কোনো মন্দ উদ্দেশ্য নেই। নির্মাণ কাজ যখন কৃষ্ণ প্রস্তরের স্থান পর্যন্ত পৌছালো তখন নতুনভাবে সমস্যার সৃষ্টি হলো।কৃষ্ণ প্রস্তর তথা হাজরে আসওয়াদ পাথরটি রাখা নিয়ে সকল গোত্রের মধ্যে ঝামেলা, কথা কাটাকাটি শুরু হয়।এই সময় মহানবী (সা:) একটি অকল্পনীয় আইডিয়া দিয়ে বিবাদের মীমাংসা করেন।তিনি বলেছিলেন একটা চাদর নিয়ে আসো,চাদর আনলে তার মাঝে বড় পাথরটা রাখা হলে মহানবী (সা:)সব গোত্রপতিগণদের আহ্বান জানিয়ে বলেন আপনারা সকলে চাদরের পার্শ্ব ধরে উত্তলন করুন।তারপর পাথরটি যথাস্থানে পৌছালে মহানবী (সা:) নিজ হাতে পাথরটি স্থাপন করেন।

নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বকালীন মুহাম্মদ

মহানবী (সা:) ছিলেন চিন্তা-চেতনার, যথার্থতা,পারদর্শিতা, এবং ন্যায় পরায়ণতার এক জ্বলন্ত প্রতীক।রাসুলুল্লাহ (সা:)কে প্রদান করা হয়েছিলো সুষমামন্ডিত দেহ,তীক্ষ্ণ বুদ্ধি যাবতীয় জ্ঞানের পরিপূর্ণতা এবং উদ্দেশ্য সাধনে সাফল্য লাভের নিশ্চয়তা।তিনি নবুওয়াত লাভের পূর্ব থেকেই মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে এবং এর অনিষ্ট সম্পর্কে কথা বলতেন এবং

যেসব লোকের উপর আস্তা ছিলো তাদের এর থেকে নিষেধ করতেন।রাসুলে আকরাম (সা:)যে যুগে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সে যুগে মক্কা ছিলো মূর্তি পূজার বিরাট কেন্দ্র। খোদ কাবা শরীফে ছিলে ৩৬০ টি মূর্তি। রাসুলুল্লাহ কখনো মূর্তির সামনে মাথা নত করেন নি।এ ছাড়া জাহেলি নানাবিদ রুসুম রেওয়াজে ও তিনি কখনে শরীক হননি।মহানবী (সা:) এর নবুওয়াত লাভের সময় যতই ঘনিয়ে আসছিলো ততই তার মেজাজে নির্জনতা ও নিঃসঙ্গ জীবনের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। তিনি অধিকাংশ সময় ছাতু আর পানি নিয়ে শহর থেকে কয়েক ক্রোশ দুরে হেরা নামক পর্বতের এক নির্জন গুহায় চলে যেতেনএবং সেখানে আল্লাহর ইবাদত করতেন।এই ইবাদতে আল্লাহর জিকির শামিল ছিল, সামিল ছিল আল্লাহর অপার কুদরতের প্রতি ধ্যান ও জ্ঞান ও।

তিনি পুরো রমজান মাস এখানে কাটাতেন; এছাড়া অন্যান্য সময়ও এখানে ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন।

হেরা গুহায় ধ্যান ও প্রথম ওহী আগমন

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসুলের (সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি সর্বপ্রথম ওহীর সূচনা হয় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা প্রভাতের আলোর মতোই সত্যে পরিণত হতো। এরপর তিনি নির্জনতা পছন্দ করতে শুরু করলেন। তিনি একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত নিজের পরিবার পরিজনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হেরা পর্বতের গুহায় নির্জন পরিবেশে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকতে লাগলেন। তিনি কিছু খাবার সাথে নিয়ে হেরা পর্বতে যেতেন। তা শেষ হলে খাদিজার (রা.) কাছে ফিরে এসে আবার কয়েক দিনের জন্য কিছু খাবার সাথে নিয়ে যেতেন। অবশেষে একদিন হেরা গুহায় থাকাকালে তার কাছে ওহী এলো।

জিবরিল (আ.) হেরা পর্বতে এসে নবিজিকে (সা.) বললেন, 'পড়ুন!' আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি তো পড়তে পারি না! নবিজি (সা.) বলেন, ফেরেশতা তখন আমাকে ধরে এমন জোরে চাপ দিলেন যে, তাতে আমি প্রবল কষ্ট অনুভব করলাম। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন!' আমি বললাম, আমি তো পড়তে পারি না। তখন দ্বিতীয়বার তিনি আমাকে ধরে আবারও খুব জোরে চাপলেন। এবারও আমি ভীষণ কষ্ট অনুভব করলাম। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন!' এবারও আমি বললাম, আমি পড়তে পারি না। ফেরেশতা তৃতীয়বার আমাকে দৃঢ়ভাবে চেপে ধরলেন। এবারও আমি অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করলাম। ফেরেশতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন,

اقْرَأْ باسمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

পড় তোমার রবের নামে; যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' থেকে। পড়, আর তোমার রব মহামহিম। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না। (সুরা আলাক: ১-৫)

আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ আয়াতগুলো আয়ত্ত করে ফিরে এলেন। তখন তার অন্তর কাঁপছিল। তিনি খাদিজাকে বললেন, চাদর দিয়ে আমাকে ঢেকে দাও। চাদর দিয়ে আমাকে ঢেকে দাও। তখন তিনি তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। তার ভয় কিছুটা কাটলে তিনি খাদিজার কাছে ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, আমি আমার নিজের জীবন সম্পর্কে আশঙ্কাবোধ করছি।

খাদিজা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে দৃঢ়তার সাথে বললেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আল্লাহ তাআলা কখনোই আপনাকে অপমানিত করবেন না। আপনি আত্মীয়স্বজনের সাথে ভালো আচরণ করেন, সর্বদা সত্য কথা বলেন, অক্ষমদের দায়িত্ব বহন করেন। নিঃস্বদেরকে উপার্জন করে সাহায্য করেন, অতিথিদের মেহমানদারি করেন এবং প্রকৃত বিপদগ্রস্তদেরকে সাহায্য করেন।

খাদিজার (সা.) চাচাতো ভাই ওয়রাকা খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল। তিনি আল্লাহর রাসুলকে সাথে নিয়ে তার চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাওফালের কাছে গিয়ে তাকে বললেন, তোমার ভাতিজা কী বলে তা একটু শোনো! ওয়ারাকা বললেন, ভাতিজা! তুমি কী দেখেছ। আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা দেখেছিলেন তা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন।

ঘটনা শুনে ওয়ারাকা বললেন, এ তো সেই রহস্যময় ফেরেশতা, যাকে আল্লাহ তাআলা মুসার (আ.) কাছে পাঠিয়েছিলেন। হায়! আমি যদি তোমার নুবুওয়্যাতকালে বলবান যুবক থাকতাম। হায়! আমি যদি সেই সময় জীবিত থাকতাম যখন তোমার সম্প্রদায় তোমাকে মক্কা থেকে বের করে দেবে। আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তারা কি সত্যই আমাকে বের করে দেবে? ওয়ারাকা বললেন, হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে দুনিয়াতে এসেছ, অনুরূপ কোন কিছু নিয়ে যে লোকই এসেছে, তার সাথেই শত্রুতাই করা হয়েছে। আমি তোমার সে যুগ পেলে সর্বশক্তি দিয়ে তোমার সাহায্য করব। এর কিছুদিন পর ওয়ারাকা মৃত্যুবরণ করলেন। এরপর বেশ কিছুদিন ওহীর আগমনও বন্ধ রইলো। (সহিহ বুখারি: ৩, সহিহ মুসলিম: ২৫২)

কিছুদিন বিরতির পর আবার ওহী আসা প্রসঙ্গে জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারি (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, একদিন আমি হাঁটছি, হঠাৎ আকাশ থেকে একটি শব্দ শুনতে পেয়ে চোখ উপরে তুললাম। দেখলাম,

সেই ফেরেশতা, যিনি হেরা গুহায় আমার কাছে এসেছিলেন, আকাশ ও জমিনের মাঝে একটি আসনে উপবিষ্ট। এই দৃশ্য দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। দ্রুত ঘরে ফিরে এসে বললাম, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর! তখন আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করলেন,

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝

হে বস্ত্রাবৃত! ওঠ ও সতর্ক কর। আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। আর তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র কর। আর অপবিত্রতা বর্জন কর। (সুরা মুদ্দাসসির: ১-৫)

এরপর থেকে পুরোদমে ধারাবাহিক ওহী অবতীর্ণ হতে লাগল। (সহিহ বুখারি: ৪)

সূরা আল মুদ্দাসসিরের উপর যুক্ত আয়াত সমূহ নাযিল হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ (সা:) পথহারা মানুষদের আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়ার কাজ শুরু করলেন,এমন অবস্থায় যে তার জাতি কুরাইশদের মূর্তি ও প্রতিমার পূজা অর্চনা ব্যতীত কোন দীন ছিল না। তাদের সঠিক কোন হজ্জ ছিল না তারা হজ্জ করত যেভাবে তাদের পিতৃপুরুষদের কে দেখেছে তাদের আত্মমর্যাদা ও বংশগৌরব ব্যতীত কোন সৎচরিত্র ছিল না। এ অবস্থায় বিশ্বজনের শেষ এবং শ্রেষ্ঠ নবী রূপে প্রেরিত হওয়া আল্লাহর রাসূল নবী করীম সাঃ দীর্ঘ তিন বছর (৪১, ৪২, ৪৩)**গোপনে** ইসলাম প্রচার করেন। এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকেই নির্দেশনা। এটা খুবই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত কথা যে যাঁরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সবচাইতে কাছের, সব চাইতে ঘনিষ্ঠ এবং সব চাইতে নির্ভরযোগ্য ছিলেন সর্ব প্রথম তিনি তাঁদেরই নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছিলেন। এ দলের মধ্যে ছিলেন পরিবারের লোকজন, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব। অধিকন্তু, প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি ঐ সকল লোককে সত্যের প্রতি আহবান জানিয়েছিলেন যাঁদের মুখমণ্ডলে কল্যাণ এবং সত্য-প্রীতির আভাষ ছিল সুস্পষ্ট। তাছাড়া যাঁরা নাবী (ﷺ)-এর সততা, সত্যবাদিতা এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সুবিদিত ছিলেন এবং এ কারণে তাঁর প্রতি এত বেশী অনুরক্ত এবং শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে, প্রথম আহবানেই সাড়া দিয়ে তাঁরা ইসলাম কবুল করেন এবং প্রথম মুসলিম হওয়ার এক দুর্লভ গৌরব অর্জন করেন। এদের তালিকার শীর্ষে ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন নাবী- পত্নী খাদীজাহতুল কোবরা (রাঃ) বিনতে খুওয়াইলিদ, তাঁর স্বাধীনতা প্রাপ্ত ক্রীতদাস যায়দ বিন হারিসাহ বিন শোরাহবীল কালবী,[1] তাঁর চাচাত ভাই আলী বিন আবূ ত্বালিব যিনি তখনো তাঁর লালন-পালনাধীন শিশু ছিলেন এবং তাঁর সওর গুহার সঙ্গী আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ)। এরা সকলে প্রথম দিনেই মুসলিম হয়েছিলেন। এই ব্যক্তিদেরকে ইসলামে 'সাবিকুনাল আউয়ালুন' বা 'প্রথমদিকের অগ্রগামী' বলা হয়।

তারপর আবূ বাকর (রাঃ) ইসলামের প্রচার কাজে বেশ তৎপর হয়ে ওঠেন। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়, কোমল-স্বভাব, পছন্দনীয় অভ্যাসের অধিকারী, সচ্চরিত্র এবং দরাজ দিল ব্যক্তি

ছিলেন। তাঁর দানশীলতা, দূরদর্শিতা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সৎ সাহচর্যের কারণে তাঁর নিকট লোকজনের গমনাগমন প্রায় সব সময় লেগেই থাকত। পক্ষান্তরে তিনি তাঁর নিকট আগমন ও প্রত্যাগমনকারী এবং আশপাশে বসবাসকারীগণের মধ্যে যাঁকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করতেন তাঁর সামনেই ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় উসমান (রাঃ), জোবায়ের (রাঃ), আব্দুর রহমান (রাঃ) বিন আওফ, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং ত্বালহাহ বিন ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। এ মহা সম্মানিত ব্যক্তিবর্গই হচ্ছেন প্রথম মুসলিম জনগোষ্ঠি।

প্রাথমিক অবস্থায় যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন বিলাল হাবশী (রাঃ)-ও ছিলেন সেই দলের অন্তর্ভুক্ত। এর পর ইসলাম কবূল করেন বনু হারিস বিন ফিহর গোত্রের আবূ 'উবায়দাহ 'আমির বিন জাররাহ (রাঃ), আবু সালামাহ বিন আব্দুল আসাদ মাখযূমী (রাঃ), আরক্বাম বিন আবিল আরক্বাম (রাঃ), উসমান বিন মাযউন যুমাহী (রাঃ), এবং তাঁর দু'ভাই যথাক্রমেঃ কুদামা এবং আব্দুল্লাহ, উবায়দাহ বিন হারিস বিন মুত্তালিব বিন আবদে মানাফ, সাঈদ বিন যায়দ এবং তাঁর স্ত্রী, অর্থাৎ উমারের বোন ফাত্বিমাহ বিনতে খাত্তাব, খাব্বাব বিন আরাত তামীমী (রাঃ), জা'ফার বিন আবূ ত্বালিব ও তার স্ত্রী আসমা বিনতে 'উমায়স, খালিদ বিন সাঈদ বিন 'আস আল উমাবী ও তার স্ত্রী আমীনাহ বিনতে খালাফ, অতঃপর তার ভাই 'আমর বিন সাঈদ বিন আস, হাতিব বিন হারিস জুমাহী ও তার স্ত্রী ফাতিমাহহ বিনতে মুখাল্লিল ও তার ভাই খাত্তাব বিন হারিস এবং তার স্ত্রী ফুকাইহাহ বিনতে ইয়াসার ও তার ভাই মা'মার বিন হারিস, মুত্তালিব বিন আযহার যুহরী ও তার স্ত্রী রামলাহ বিনতে আবূ 'আওফ, নাঈম বিন আবদুল্লাহ বিন নুহাম আদবী (রাঃ), এদরে সকলেই কুরাইশ ও কুরাইশের বিভিন্ন শাখা গোত্রের।

কুরাইশ ব্যতীত অন্য গোত্র থেকে প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণকারীরা হলেন, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, মাসউদ বিন রাবী'আহ, আব্দুল্লাহ বিন জাহশ আসাদী ও তার ভাই আহমাদ বিন জাহশ, বিলাল বিন রিবাহ হাবশী, সুহাইব বিন সিনান রূমী, 'আম্মার বিন ইয়াসার আনসী, তার পিতা ইয়াসার ও তার মাতা সুমাইয়া এবং আমির বিন ফুহাইরাহ।

উপরে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলমান মহিলাদের মধ্যে রয়েছেন, উম্মু আইমান বারাকাত হাবশী, উম্মুল ফযল লুবাবাতুল কুবরা বিনতে হারিস হিলালিয়াহ (আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের স্ত্রী), আসমা বিনতে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)।

উপরে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ প্রথম পর্যায়ের ইসলাম গ্রহণকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ। বিভিন্নভাবে অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে যে, প্রথম পর্যায়ের ইসলাম গ্রহণকারীর গুণে গুণম্বিতদের সংখ্যা পুরুষ-মহিলা মিলে ৩৩০ জন। তবে এটা অকাট্যভাবে জানা যায় নি যে, তারা সকলেই প্রকাশ্যে দাওয়াত চালু হওয়ার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন নাকি

ইসলামের দাওয়াত প্রকাশ্যভাবে চালু হওয়া পর্যন্ত তাদের কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করেছিলেন।

প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত

আল্লাহ তা‘আলার এ বাণী অবতীর্ণ হয়:

(وَأَنذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ) [الشعراء:214]،

‘‘আর তুমি সতর্ক কর তোমার নিকটাত্মীয় স্বজনদের।’ (আশ-শু‘আরা ২৬ : ২১৪)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে যখন তাঁর আত্মীয়-পরিজন এবং স্বগোত্রীয় লোকজনদের নিকট দ্বীনের প্রকাশ্য দাওয়াত পেশ করার নির্দেশ দেয়া হল তখন তিনি প্রকাশ্যে দীন প্রচারের কাজ শুরু করলেন। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নাবী কারীম (ﷺ) বনু হাশিম গোত্রকে একত্রিত করে এক সম্মেলনের আয়োজন করেণ। সেই সম্মেলনে বনু মুত্তালিব বিন আবদে মানাফেরও এক দল লোক উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে উপস্থিত লোকদের সংখ্য ছিল **পঁয়তালি-শ** জন। সম্মেলনের শুরুতেই আবূ লাহাব আকস্মিকভাবে বলে উঠলেন, ‘দেখ এঁরা সকলেই তোমার নিকট আত্মীয়- চাচা, চাচাত ভাই ইত্যাদি। বাচালতা বাদ দিয়ে এদের সঙ্গে ভালভাবে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করবে। তোমার জানা উচিত যে তোমার জন্য সকল আরববাসীদের সঙ্গে শত্রুতা করার শক্তি আমাদের নেই। তোমার আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষে তোমাকে ধরে কারারুদ্ধ করে রাখাই কর্তব্য। সুতরাং তোমার জন্য তোমার পিতৃ-পরিবারই যথেষ্ট। তুমি যদি তোমার ধ্যান-ধারণা এবং কথাবার্তায় অটল থাক তবে এটা অনেক সহজ এবং স্বাভাবিক যে সমগ্র কুরাইশ গোত্র তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে এবং অন্যান্য আরব গোত্র এ ব্যাপারে সহযোগিতা করবে। তারপর এটা আমার জানার বিষয় নয় যে, স্বীয় পিতৃপরিবারের আর অন্য কেউ তোমার চাইতে বড় সর্বনাশা হতে পারে। আবূ লাহাবের এ জাতীয় অর্থহীন আস্ফালনের প্রেক্ষাপটে নাবী কারীম (ﷺ) সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করলেন এবং ঐ নীরবতার মধ্য দিয়েই সম্মেলন শেষ হয়ে গেল।

এরপর নাবী কারীম (ﷺ) স্বগোত্রীয় লোকজনদের একত্রিত করে দ্বিতীয় সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন। সম্মেলনে উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন,

الحَمْدُ لِلهِ، أَحْمَدُهُ وَأَسْتَعِيْنُهُ، وَأُوْمِنُ بِهِ، وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ

“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, আমি তাঁর প্রশস্তি বর্ণনা করছি এবং তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করছি। তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি, তাঁর উপরেই নির্ভর করছি এবং সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউই উপাসনার যোগ্য নয়। তিনি একক এবং অদ্বিতীয়, তাঁর কোন অংশীদার নেই। এভাবেই তিনি তার আত্মীয় সজনদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকেন।

নবী করিম সাঃ এর বয়স যখন ৪৪ বছরে পৌছালো তিনি **সাফা** পর্বতের চূড়ায় উঠে সবাইকে আহবান করলেন, এ আহবান শ্রবণ করে সকলেই সেখানে সমবেত হয়ে গেলেন। এমনকি কোন ব্যক্তির পক্ষে তাঁর উপস্থিতি সম্ভব না হলে ব্যাপারটি সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য তিনি প্রতিনিধি প্রেরণ করলেন। ফলকথা হচ্ছে কুরাইশ গোত্রের সকলকেই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। আবূ লাহাবও উপস্থিত ছিলেন।

তারপর নাবী কারীম (ﷺ) বললেন,

(أَرَأَيْتُكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِيِّ بِسَفْح هٰذَا الْجَبَلِ تُرِيْدُ أَنْ تَغَيَّرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟)

“হে কুরাইশ বংশীয়গণ! তোমরা বল, আজ (এ পর্বত শিখরে দাঁড়িয়ে) যদি আমি তোমাদিগকে বলি যে, পর্বতের অন্য দিকে এক প্রবল শত্রু সৈন্য বাহিনী তোমাদের যথা-সর্বস্ব লুণ্ঠনের জন্য অপেক্ষা করছে তাহলে তোমরা আমার এ কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে কি?

সকলে সমস্বরে উত্তর করল হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, বিশ্বাস না করার কোনই কারণ নেই। আমরা কখনো আপনাকে মিথ্যার সংস্পর্শে আসতে দেখি নি।

তখন গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলতে লাগলেন ,

(إِنِّىْ نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيْدٍ، إِنَّمَا مَثَلِىْ وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَأَي الْعَدُوَّ فَانْطَلَقَ يَرْبَأُ أَهْلَهُ) (أَيْ يَتَطَلَّعُ وَيُنْظَرُ لَهُمْ مِنْ مَكَانٍ مُّرْتَفِعٍ لِئَلاَّ يُدْهِمُهُمْ الْعَدُوُّ) (خَشِيَ أَنْ يَسْبِقُوْهُ فَجَعَلَ يُنَادِىْ: يَا صَبَاحَاه)

“যদি তাহাই হয়, তবে শ্রবণ করুন। আমি আপনাদেরকে (পাপ ও আল্লাহ দ্রোহিতার ভীষণ পরিণাম ও তজ্জনিত) অবশ্যম্ভাবী কঠোর দন্ডের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি ....।

অতঃপর সাধারণ ও বিশেষভাবে সকলকে সত্যের পথে আহ্বান জানালেন এবং তাদেরকে আল্লাহর কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করালেন।এমনকি সকল গোত্রের লোকদের ডেকে ডেকে জাহান্নামের শাস্তি ও আজাব থেকে বাচার উদাত্ত আহ্বান জানালেন।

যখন এ ভীতিপ্রদর্শনমূলক বক্তব্য শেষ হলো সম্মেলন ভেঙ্গে গেল ও লোকজন যার যার মতো চলে গেল, কেউ কোন প্রতিবাদ করল না। কিন্তু আবূ লাহাব মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে নাবী (র)-এর নিকটে এসে বলে উঠলেন, 'তোর সর্বনাশ হোক! এ জন্য কি তুই এখানে আমাদেরকে সমবেত করেছিস? এর ফলশ্রুতিতে আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হলো :[2]

(تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَتَبَّ) [سورة المسد:1]

''আবূ লাহাবের হাত ধ্বংস হোক।' (আল-মাসাদ ১১১ : ১)

কুরাইশ কর্তৃক মুসলিম নির্যাতন

আল্লাহর দেওয়া দীন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে মহানবী (স.) অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। অমানুষিক নিপীড়ন ও অকথ্য নির্যাতন নীরবে সহ্য করেছেন। আল্লাহর দেওয়া দায়িত্ব পালনে সামান্য ত্রুটিও করেননি। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'অতএব আপনি উপদেশ দিতে থাকেন। কেননা আপনি উপদেশদাতা বৈ কিছুই নন। আপনি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নন।' (সুরা গাশিয়া: ২১-২২)

কোনোভাবেই যখন দীনপ্রচার থামানো গেল না, তখন কুরাইশরা মুসলিমদের ওপর অত্যাচার ও নিপীড়ন শুরু করে। মুসলিম তৎপরতা ঠেকাতে মক্কার শীর্ষস্থানীয় ২৫ ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়। যার নেতৃত্বে ছিল আবু লাহাব ইবনে আবদুল মুত্তালিব। তারা মুসলিমদের ওপর সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার অনুমোদন করে।

বিশেষ করে যারা দরিদ্র মুসলমান ছিল তাদের উপর অন্যায় অত্যাচারের স্টিমরোলার চালাত। তাদের শরীর থেকে চামড়া ছিলে ফেলা সহ এমন সব পাশবিক অত্যাচার করত যা পাষাণ হৃদয় ব্যক্তিটি ও প্রত্যক্ষ করে অস্থির কিংবা বিচলিত না হয়ে পারতেন না। আবু জাহল যখন কোন সম্ভ্রান্ত বা শক্তিধর ব্যক্তির মুসলিম হওয়ার কথা শুনত তখন সে তাকে ন্যায় অন্যায় ভাবে গালিগালাজ করতো, অপমান অপদস্ত করত ধন সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি করত।

হজের মৌসুমে আবু লাহাব রাসুল (স.)-এর পিছে লেগে থাকত। যেখানেই রাসুল (স.) দাওয়াত দিতেন, সেখানেই সে তাঁকে গালি দিয়ে লোকদেরকে ভাগিয়ে দিত এবং বলত, إِنَّهُ صَابِئٌ كَذَّابٌ فَلاَ تُصَدِّقُوْه 'এ লোকটি বিধর্মী মিথ্যাবাদী তোমরা এর কথা বিশ্বাস করো না।' (আহমদ: ১৬০৬৬, ১৬০৬৯; সহিহ ইবনে খুজাইমা: ১৫৯, সনদ সহিহ)। এমনকি 'যুল মাজাজ' নামক বাজারে যখন তিনি লোকদের বলছিলেন, তোমরা বলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তাহলে সফলকাম হবে', তখন পেছন থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে সে পাথর

ছুঁড়ে মারে। তাতে নবীজির পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত রক্তাক্ত হয়ে যায়। (সহিহ ইবনে হিববান, হাকেম ২/৬১১; দারাকুতনি: ২৯৫৭; তাফসিরে কুরতুবি)
মহানবী (স.)-এর অনন্য ব্যক্তিত্ব, বংশীয় মর্যাদা ও আবু তালিবের আশ্রয়ের কারণে তাঁর ওপর সরাসরি আঘাত করা সহজ ছিল না। তাই তাদের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয় দরিদ্র ও অসহায় মুসলিমরা। রাসুলুল্লাহ (স.), আবু বকর ও উসমান (রা.)-এর মতো অভিজাত ব্যক্তিরা প্রথমে নির্যাতন থেকে মুক্ত থাকলেও পরবর্তী সময়ে তারাও নানা অত্যাচার ও লাঞ্ছনার শিকার হন। (আর-রাহিকুল মাখতুম, পৃষ্ঠা: ৯৮-৯৯)
আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার স্বচক্ষে দেখা একটি ঘটনার বর্ণনা দেন। তিনি বলেন একদিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা শরীফের নামাজ পড়ছিলেন এ সময় উকবা ইবনে মুয়িত এসে হাজির হলো সে তার চাদর পাকিয়ে রশির নাই বানালো এরপর রাসুল (সা:) সিজদায় যেতেই চাদরটি রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লামের গলায় ফাঁস আকারে ফেলে মোচরের পর মোচর দিতে লাগল। ফাঁসের কারণে রাসূল (সা:)এর দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। এতদসত্ত্বেও রাসুল (সাঃ) পরিপূর্ণ প্রশান্তির সঙ্গে সিজদায় পড়ে থাকলেন। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে হযরত আবু বক্কর দৌড়ে আসেন ধাক্কা দিয়ে উকবাকে সরিয়ে দেন।এ সময় কয়েকজন দুষ্টু প্রকৃতির লোক হযরত আবু বক্কর সিদ্দিক (রা:)এর ওপর ঝাপিয়ে পড়ে এবং তাকে বেদম প্রহার করে।
আরেক দিন মহানবী (স.) মসজিদুল হারামে সেজদারত অবস্থায় ছিলেন। তখন উকবা ইবনে আবি মুয়িত আল্লাহর রাসুলের মাথার ওপর মরা উটের নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দেয়। ফলে তিনি উঠতে পারছিলেন না। ফাতেমা (রা.) দৌড়ে এসে তাঁর ওপর থেকে নাড়িভুঁড়ি সরিয়ে দেন। ভারমুক্ত হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ (স.) ওই পাষণ্ডসহ আরো কয়েকজনের নাম ধরে বদদোয়া করেন। তিনি বলেন, ‘হে আল্লাহ, আবু জাহেলকে পাকড়াও করো, উতবা ইবনে রাবিয়া, শায়বা ইবনে রাবিয়া, ওয়ালিদ ইবনে উতবা, উমাইয়া ইবনে খালফ এবং উকবা ইবনে আবি মুয়িতকে পাকড়াও করুন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) যাদের বদদোয়া করেছিলেন তাদের বদরের দিন কূপের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখেছি।’ (নবীয়ে রহমত, পৃষ্ঠা ১৩৫ ও ১৩৭; আর-রাহিকুল মাখতুম, পৃষ্ঠা-১০৪)।
হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা ইসলাম গ্রহণ করার পর তার মনিব উমাইয়া দুপুরের তপ্ত রোদে জ্বলন্ত বালুর উপর শুয়ে দিয়ে তার বুকের উপর ভারী পাথর চাপে দিত, যাতে তিনি পাশ ফিরতে না পারেন। তারপর তাকে লক্ষ্য করে বলা হতো ইসলাম ত্যাগ করো নইলে এভাবে তোকে তিল তিল করে মেরে ফেলা হবে হুমকি দেয়া হতো। এ সময় মুখে তিনি কেবল ‘আহাদ আহাদ’ আল্লাহ এক উচ্চারণ করতেন। যখন তিনি কিছুতেই ইসলাম ত্যাগ করতে রাজি হল না তখন তার গলায় রশি বেঁধে মহল্লার ছেলেদের হাতে ছেড়ে

দেওয়া হলো শহরে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা টেনে - হিঁচরে নিয়ে বেড়াল। তখনো মুখে সেই এক শব্দ 'আহাদ আহাদ'(আল্লাহ এক,আল্লাহ এক)।
পাষণ্ড আবু জাহেল আম্মারের মা সুমাইয়ার নারী অঙ্গে বর্ষা দিয়ে আঘাত হানে। আর এই আঘাতেই তিনি শাহাদাত লাভ করেন। মুসলিম মহিলাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রথম শহীদ। এভাবে নির্যাতনের শিকার হতে থাকলেন, আম্মার (রা),সুহাইব (রা:),আবু ফুকায়হা (রা:),লুবায়না (রা:),যিন নায়রা (রা:),হযরত উসমান (রা:),হযরত আবু যর (রা:),হযরত আবু বক্কর (রা:) সহ আরেক অনেক মাজলুম মুসলিম।

আবিসিনিয়ায় মুসলমানদের হিজরত

মুসলমানদের ওপর কাফেরদের অত্যাচার ও নির্যাতন মাত্রা যখন সকল সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামগণকে আপন জীবন ও ঈমান রক্ষার্থে আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি দিলেন।
আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজাশী ছিলেন একজন ন্যায় পরায়ণ ও দয়ালু বাদশাহ। নাজাশী কারো প্রতি অন্যায় -অত্যাচার করতো না।এই হিজরতের ঘটনা ঘটে মহানবী (সা:) নবুওয়াত প্রাপ্তির পঞ্চম বছরে অর্থাৎ মহানবী সাঃ এর বয়স যখন ৪৫ বছর।এই হিজরতের ঘটনা পরপর দুইবার ঘটে। অনুমতি প্রাপ্তের পর প্রথবার ১১ জন পুরুষ ও পাঁচজন মহিলার একটি ক্ষুদ্র কাফেলা রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়েন এবং শুআয়বা বন্ধরে গিয়ে আবিসিনিয়াগামী জাহাজে আরোহণ পূর্বক রওনা হন। এই ক্ষুদ্র কাফেলার সরদার ছিলেন হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা:)। তার স্ত্রী নবীকন্যা হযরত রুকাইয়া রাঃ ছিলেন তার সহগামী।
২য় বার এদের পেছনে ৮৩ জন পুরুষ ও ১৮ জন মহিলার আরেকটি দল মক্কা থেকে বহির্গত হয় এবং আবিসিনিয়ায় রওনা করে।

হামযাহ (রা:) এর ইসলাম গ্রহণ

নবুওয়ত প্রাপ্তি ৬ষ্ঠ বর্ষের শেষভাগে হামযাহ (রা:) যুল হিজ্জাহ মাসে মুসলিম হয়েছিলেন। এক দিনে ছাফা পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাবার সময় আবু জাহল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অশ্লীল ভাষায় তাঁকে ও তাঁর দ্বীনকে গালি দেন।রাসূলুল্লাহ (সা:) নীরবে সবকিছু সহ্য করেন ও চুপচাপ বাড়ী ফিরে যান।আব্দুল্লাহ বিন জুদ'আনের জনৈকা দাসী ছাফা পাহাড়ে তার বাসা থেকে এ দৃশ্য অবলোকন করে। ঐ সময় হামযা বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব মৃগয়া থেকে তীর-ধনুকে সজ্জিত অবস্থায় ঘরে ফিরছিলেন। তখন উক্ত দাসী তার নিকটে সব ঘটনা খুলে

বললে তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ছুটলেন আবু জাহলের খোঁজে। তিনি গিয়ে আবু জাহলকে মাসজিদুল হারামে পেলেন। অতঃপর তীব্র ভাষায় তাকে গালি দেন ও তার মাথায় ধনুক দিয়ে এমন জোরে আঘাত করেন যে, আবু জাহল তাতে রক্তাক্ত হয়ে যান। অতঃপর বলেন, তুমি তাকে গালি দিয়েছ, অথচ আমি তার দ্বীনের উপরে আছি।হামযার এই ইসলাম কবুলের ঘোষণাটি ছিল আকস্মিক এবং ভাতিজার প্রতি ভালোবাসার টানে। পরে আল্লাহ তাঁর অন্তরকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন এবং তিনি নির্যাতিত মুসলমানদের পক্ষে শক্তিশালী ও নির্ভর কেন্দ্র হিসাবে আবির্ভূত হন। বস্ত্ততঃ এটি ছিল রাসূল (ছাঃ) ও নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হ'তে বিশেষ রহমত এবং একটি দৃঢ় রক্ষাকবচ।

উমার (রা:) এর ইসলাম গ্রহণ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়াতের ৬ষ্ঠ বর্ষে উমার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন। হামজা (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণের মাত্র ৩ দিন পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।নবী কারীম (সাঃ) উমার (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন।

উমার (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত বিবরণাদির সমন্বিত সার সংক্ষেপ হচ্ছে এক রাত্রি তাঁকে বাড়ির বাইরে অবস্থানের মধ্য দিয়ে রাত্রি যাপন করতে হয়। তিনি হারামে আগমন করেন এবং ক্বাবা'হ গৃহেরপর্দার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। নাবী কারীম (ﷺ) সেই সময় নামাযে লিপ্ত ছিলেন। নামাযে তিনি সূরাহ 'আলহাক্কা'' তিলাওয়াত করছিলেন। উমার (রাঃ) নীরবে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তিলাওয়াত শ্রবণ করলেন এবং এর ঝংকার, বাক্য বিন্যাস ও সুর-মাধূর্যে মুগ্ধ, চমৎকৃত ও হতবাক হয়ে গেলেন।

উমারের বর্ণনা সূত্রে এটা বলা হয়েছে যে, তিনি বলেছেনঃ আমি মনে মনে করলাম, আল্লাহর কসম, কুরাইশরা যেমনটি বলে থাকেন তিনি হচ্ছেন একজন কবি। কিন্তু এ সময় নাবী (ﷺ) এ আয়াত পাঠ করেনঃ

(إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلاً مَا تُؤْمِنُوْنَ) [الحاقة:40، 41]

''যে, অবশ্যই এ কুরআন এক মহা সম্মানিত রসূল [জিবরীল ('আ.)]-এর (বহন করে আনা) বাণী। ৪১. তা কোন কবির কথা নয়, (কবির কথা তো) তোমরা বিশ্বাস করো না।' (আল-হাক্কাহ ৬৯ : ৪০-৪১)

উমার (রাঃ) বললেন, 'আমি মনে মনে বললাম, আর এ তো হচ্ছে আমারই মনের কথা, সে কী করে তা জানল। নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ﷺ) হচ্ছেন একজন মন্ত্রতন্ত্রধারী গনৎকার। আমার মনে এ ভাবের উদয় হওয়ার পর-পরই মুহাম্মাদ (ﷺ) তিলাওয়াত করলেনঃ

(وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلًا مَا تَذَكَّرُوْنَ تَنزِيْلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ) إلى آخر السورة [الحاقة:42، 43]

'' এটা কোন গণকের কথাও নয়, (গণকের কথায় তো) তোমরা নাসীহাত লাভ করো না। ৪৩. এটা বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ।' (আল-হাক্কাহ ৬৯ : ৪২-৪৩)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাতে সূরাহর শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন এবং উমার (রাঃ) তা শ্রবণ করলেন। এ প্রসঙ্গে উমার (রাঃ) বলেছেন যে, 'সেই সময় ইসলাম আমার অন্তর রাজ্যে স্থান অধিকার করে বসল।তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির লোক। তাঁর স্বভাবগত কঠোরতার কারণেই তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং মুসলিমদের অন্যতম বিপজ্জনক শত্রু। তিনি এতই বিপজ্জনক ছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এক দিবসে তিনি উলঙ্গ তরবারি হাতে বহির্গত হন। রুদ্র মেজাজে তাঁর পথচলার এক পর্যায়ে আকস্মিকভাবে নঈম বিন আব্দুল্লাহ নাহহাম আদভী[5] কিংবা বনু যুহরা[6] কিংবা বনু মাখযুমের[7] কোন এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁর ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত অবস্থায় দেখে সেই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, 'হে উমার! কী উদ্দেশ্যে কোথায় চলেছ? তিনি বললেন, 'মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে চলেছি।'

লোকটি বলল, 'মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে হত্যা করে বনু হাশিম ও বনু যুহরা থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে? উমার বললেন, 'মনে হচ্ছে তোমরাও পূর্ব পুরুষগণের ধর্ম পরিত্যাগ করে বেদ্বীন হয়ে গিয়েছ।

লোকটি বলল, 'উমার! একটি আজব কথা তোমাকে শোনাব না কি? তোমার বোন ও ভগ্নিপতিও তোমাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে বেদ্বীন হয়ে গিয়েছে।'

এ কথা শুনে উমার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুন্ডে ঘৃতাহুতি দেয়ার মতো ক্রোধাগ্নিতে দপ করে জ্বলে উঠলেন এবং সোজা ভগ্নীপতির গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। সেখানে খাব্বাব বিন আরাত্ত একটি সহীফার সাহায্যে সূরাহ ত্ব-হা'র অংশ বিশেষ স্বামী-স্ত্রীকে তালীম দিচ্ছিলেন। খাব্বাব তাঁদের তালীম দেয়ার জন্য নিয়মিত সেখানে যাতায়াত করতেন। খাব্বাব (রাঃ) যখন উমার (রাঃ)-এর সেখানে গমনের শব্দ শ্রবণ করলেন তখন তিনি ঘরের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করলেন এবং উমারের বোন ফাত্বিমাহ সহীফা খানা লুকিয়ে রাখলেন। কিন্তু উমার বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে খাববাবের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলেন। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কার কণ্ঠে মৃদু মৃদু আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম যেন।'

তাঁর বোন উত্তর করলেন, ‘না তেমন কিছুই না। আমরাই পরস্পর কথাবার্তা বলছিলাম। উমার (রাঃ) বললেন, ‘সম্ভবতঃ তোমরা উভয়েই বেদ্বীন হয়ে গিয়েছ?
ভগ্নিপতি সাঈদ বললেন, আচ্ছা উমার! বলত, তোমাদের ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে যদি সত্য থাকে তবে করণীয় কী হবে?
এ কথা শোনা মাত্র উমার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে ভগ্নীপতিকে নির্মমভাবে প্রহার করতে শুরু করলেন। নিরুপায় ভগ্নী জোর করে ভ্রাতাকে স্বামী থেকে পৃথক করে দিলেন। এতে আরও ক্রুব্ধ হয়ে উমার (রাঃ) তাঁর বোনের গন্ডদেশে এমন এক চপেটাঘাত করলেন যে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে গেল। ইবনে ইসহাক্বের বর্ণনায় আছে যে, তিনি মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভগ্নী ক্রোধ ও আবেগ জড়িত কণ্ঠে বললেন,
يَا عُمَرُ، إِنْ كَانَ الْحَقُّ فِيْ غَيْرِ دِيْنِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ

‘‘উমার! তোমার ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্ম যদি সত্য হয়, এ কথা বলে তিনি কালেমা শাহাদত পাঠ করলেন, ‘আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রাসূল।’
শাহাদতের এ বাণী শ্রবণ করা মাত্র উমার (রাঃ)-এর ভাবান্তর শুরু হয়ে গেল। তিনি তাঁর বোনের রক্তাক্ত মুখমণ্ডল দেখে লজ্জিত হলেন। তারপর তিনি বোনকে সম্বোধন করে দয়ার্দ্র কণ্ঠে বললেন, ‘তোমাদের নিকট যে বইখানা আছে তা আমাকে একবার পড়তে দাওনা দেখি।
বোন বললেন, ‘তুমি অপবিত্র রয়েছ। অপবিত্র লোকের এটা স্পর্শ করা চলে না। শুধু মাত্র পবিত্র লোকেরাই এ বই স্পর্শ করতে পারবে। তুমি গোসল করে এসো তবেই বই স্পর্শ করতে পারবে। উমার গোসল করে পাক-সাফ হলেন তার পর সহীফা খানা হাতে নিলেন এবং বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম পড়লেন। বলতে লাগলেন এ তো বড়ই পবিত্র নাম! তারপর সূরাহ ত্ব-হা হতে পাঠ করতে শুরু করলেন।পড়া শুরু করে কিছুদূর অগ্রসর হতেই তিনি পরম আবেগ ভরে বলে উঠলেন কত উত্তম এ কালাম এবং কত মর্যাদা মন্ডিত এ বাণী। উমরের মুখে একথা শুনতেই পূর্ব থেকেই ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকা সাহাবী খাব্বাব (রাঃ) বেরিয়ে এলেন এবং বললেন উমর আমি আশা করছি আল্লাহ তাআলা তার নবীর দোয়া কবুল করেছেন। আমি গতকালই তাকে এই দোয়া করতে শুনেছি,হে আল্লাহ আবুল হাকাম (আবু জাহেল) কিংবা উমর ইবনুল খাত্তাবের মাধ্যমে এই দিন কে তুমি সাহায্য করো। খাব্বাব (রাঃ)-এর মুখ থেকে এ কথা শ্রবণের পর উমর বললেন, খাব্বাব, আমাকে তুমি বলো মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথায় আছেন যাতে তার পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম কবুল করতে পারি। কাবাব ঠিকানা দিলেন।উমার (রাঃ) তাঁর তরবারিখানা কোষে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে সেই বাড়ির বহিরাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে দরজায়

করাঘাত করলেন। দরজার ফাঁক দিয়ে এক ব্যক্তি উঁকি দিয়ে দেখতে পেলেন যে, কোষবদ্ধ তলোয়ারসহ উমার দন্ডায়মান রয়েছেন। ঝটপট রাসূলুল্লাহ (রাঃ)-কে তা অবগত করানো হল। উপস্থিত লোকজন যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন সকলেই সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি অবস্থায় সংঘবদ্ধ হয়ে গেলেন। সকলের মধ্যে এ সন্ত্রস্ত ভাব লক্ষ করে হামযাহ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার, কী এমন হয়েছে?'

লোকজনেরা উত্তর দিলেন, 'উমার বহিরাঙ্গনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।'

হামযাহ বললেন, 'ঠিক আছে। উমার এসেছে, দরজা খুলে দাও। যদি সে সদিচ্ছা নিয়ে আগমন করে থাকে তাহলে আমাদের তরফ থেকেও ইন-শা-আল্লাহ সদিচ্ছার কোনই অভাব হবে না। আর যদি সে কোন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে আগমন করে থাকে তাহলে আমরা তাকে তার তলোয়ার দ্বারাই খতম করব। এ দিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছিল। ওহী নাযিল সমাপ্ত হলে তিনি উমারের নিকট আগমন করলেন বৈঠক ঘরে। তিনি তাঁর কাপড় এবং তরবারির কোষ ধরে শক্তভাবে টান দিয়ে বললেন,

(أَمَا أَنْتَ مُنْتَهِيًا يَا عُمَرُ حَتّٰى يَنْزِلَ اللهُ بِكَ مِنْ الْخَزِى وَالنِّكَالِ مَا نَزَلَ بِالْوَلِيْدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ؟)

''উমার! যেমনটি ওয়ালীদ বিন মুগীরার উপর অবতীর্ণ হয়েছিল সেইরূপ আল্লাহর তরফ থেকে যতক্ষণ না তোমার উপর লাঞ্ছনা, অবমাননা এবং শিক্ষামূলক শাস্তি অবতীর্ণ না হচ্ছে ততক্ষণ কি তুমি পাপাচার থেকে বিরত হবে না?'

তারপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহর সমীপে দু'আ করলেন,

اللهم هٰذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، اللهم أَعِزِّ الْإِسْلاَمَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

''হে সর্বশক্তিমান প্রভূ! তোমার ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছাই হচ্ছে চূড়ান্ত। এ উমার বিন খাত্তাবের দ্বারা ইসলামের শক্তি এবং সম্মান বৃদ্ধি করুন।' নাবী (ﷺ)-এর প্রার্থনা শ্রবণের পর উমার (রাঃ)-এর অন্তরে এমন এক স্পন্দনের সৃষ্টি হতে থাকল যে, তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন এবং পাঠ করলেন,

أَشْهَدُ أَن لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ

অর্থঃ 'আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং সত্যই আপনি আল্লাহর রাসূল।'

উমার (রাঃ)-এর মুখ থেকে তাওহীদের এ বাণী শ্রবণ মাত্র গৃহাভ্যন্তরস্থিত লোকজনেরা এত জোরে 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনি উচ্চারণ করলেন যে, মসজিদুলু হারামে অবস্থানকারী লোকেরাও তা স্পষ্টভাবে শুনতে পেলেন।তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার ফলে মুসলিমদের শক্তি

সাহস ও মান মর্যাদা উল্লে-খযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়ে গেল এবং তাঁদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার প্রবাহিত হতে থাকল।
হযরত উমার (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামের ইতিহাসে নতুন যুগ শুরু হয় তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৪০-৫০ এর মত। আরবের সাইয়েদু শুহাদা,হামযা (রাঃ) মাত্র কিছুদিন আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তবুও মুসলমানরা প্রকাশ্যে ইবাদত বন্দেগি করতে পারত না।কাবা প্রাঙ্গনে নামাজ আদায় ছিল আরও অসম্ভব। হযরত উমর রাঃ এর ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই আকস্মিকভাবে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। মুসলমানরা প্রকাশ্যে ইসলামে কথা বলতে লাগলো। কাফেররা প্রথম প্রথম তো খুবই কঠোরতা প্রদর্শন করতে থাকে। কিন্তু মুসলমান খুবই দৃঢ়তার সঙ্গে অবস্থার মোকাবেলা করতে থাকেন এমন কি এক পর্যায়ে তারা কাবা প্রাঙ্গনে গিয়ে জামাতের সাথে নামাজও আদায় করেন।

সর্বাত্মক বয়কট এবং অঙ্গীকারনামা বিনষ্ট

বয়কটের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো নবুওয়াতের ৭ম বর্ষের মুহাররম মাসের শুরু থেকে বয়কটের সূচনা হয়। কুরাইশরা দেখল ইসলাম গ্রহনকারীদের একটা বড় অংশ হাবশায় চলে গিয়ে সম্রাট নাজ্জাশীর কাছে সম্মানজনক আশ্রয় পেয়ে গেছে। কুরাইশদের হাত থেকে তারা নিষ্কৃতি পেয়ে গেছে। এদিকে হামযা ও উমরের মত প্রভাবশালী লোকেরা মুসলমান হয়ে যাওয়ায় ওরা বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আরবের অপরাপর গোত্রেও মুসলমান সংখ্যা ক্রমে বাড়ছেই। কুরাইশরা শঙ্কিত হলো এবং এ ব্যাপারে একটি ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তারা সমবেত হলো।
অনেক কথাবার্তার পর সাব্যস্ত হলো, বনু হাশেম আর বনু মুত্তালিবকে বয়কট করা হবে। কেনাবেচা, লেনদেন, বিয়ে-শাদী এবং সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছেদ করা হবে, যতদিন না ওরা ওই পথ ত্যাগ করে কিংবা ধ্বংস হয়ে যায়। এ মর্মে আল্লাহর নামে একটা হলফনামা তৈরী হবে। এবং তা সম্পূর্ণ অলংঘনীয় করার জন্য কাবার দরজায় টানিয়ে রাখা হবে। শেষ পর্যন্ত তাই করা হলো।
দীর্ঘ ৩বছর এ দুঃসহ বয়কট চলেছিল। মুসলমানরা এবং যারা তাদের সহায়তাকারী করলেন তারা অবর্ণনীয় দুঃখ ও দুর্দশার শিকার হন। বনী হাশেম থেকে একমাত্র দুরাত্মা আবূ লাহাবই স্বপক্ষ ত্যাগ করে কাফেরদের সাথে যোগ দেয়। শা'বে আবূ তালিব নামক গিরিসংকটে এ দীর্ঘ দুঃসহ দিনগুলো তাঁদের কাটে।

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ ও দুর্দশায় যখন তাঁরা প্রায় অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন, তখনই আল্লাহ্ পাকের কুদরতী সাহায্য তাদের মুক্তি দান করে। এ ব্যাপারে একই সাথে দুটি ব্যাপার ঘটে। কুরায়শদের মাঝে যাদেরকে আল্লাহর পছন্দ ছিল, তেমন কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোকের অন্তরে মানবতা ও মমত্ববোধ প্রবল করে দেওয়া হলো। তাদের মাঝে হিশাম ইব্ন আমর একেবারে অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে গোপনে বহুবার মুসলমানদের সাহায্য করেছেন। একদিন অস্থির হয়ে যুহাইর ইব্ন উমাইয়ার কাছে গিয়ে মনের কথা খুলে বললেনঃ ‘হে যুহাইর! এটাই কি তোমার ভাল লাগে যে তুমি খেয়েপরে মহাসুখে থাকবে আর তোমার মাতুল বংশ দুঃসহ বয়কটে অবর্ণনীয় কষ্টে শেষ হয়ে যাবে ? আমি আল্লাহর কসম করে বলতে পারি, ওরা যদি আবূ জেহেলের মাতুল হতো তবে সে এরুপ নিষ্ঠুর কাজে কখনই সায় দিত না।

যুহাইর বললেনঃ ‘সেটা কি আমি বুঝি না হিশাম ! কিন্তু কি করব বল ! আমার সাথে যদি একজন লোকও থাকত, তবে এ চুক্তি বাতিল করার চেষ্টা করতাম এবং অবশ্যই তা করেই ছাড়তাম।’

হিশাম বললেনঃ আমি আছি তোমার সাথে। যুহাইর বললেনঃ তবে দেখ তো আর কাউকে পাওয়া যায় কি না ! এরপর হিশাম একে একে মুত্বঈম ইব্ন আদী, আবুল বাখতরী, যামআ ইব্ন আসওয়াদ এ তিনজন বিশিষ্ট নেতার সাথে একইরকম কথা বললেন- সকলেই একমত হলেন- অবশ্যই যে কোন মূল্যে এ চুক্তি বাতিল করতে হবে।

সিদ্ধান্ত হলো আগামীকালই এ কাজ করা হবে। যুহাইর বললেনঃ এ ব্যাপরে আমিই সকলের আগে থাকব এবং কথা বলব।

অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর চাচা আবূ তালিবকে বললেন, চাচা ! কুরায়শরা যে চুক্তি করেছে তাতে আল্লাহ্ নারাজ হয়েছেন এবং উইপোকাকে আদেশ করেছেন চুক্তিনামা খেয়ে ফেলতে। চুক্তির যে স্থানে ‘আল্লাহ্ নাম লেখা আছে শুধু সেটুকু বাদে বাকি সবটুকুই পোকা খেয়ে ফেলেছ।’

আবূ তালিব বললেনঃ ‘তোমরা আল্লাহ্ কি তোমাকে একথা জানিয়েছেন ?’ তিনি বললেন,হ্যাঁ,। আবূ তালিব বললেনঃ ভাতিজা ! তাহলে আল্লাহর কসম ! আর কোন ক্ষতি তোমার কেউ করতে পারবে না। আমি চললাম, এ বলে তিনি কাবা ঘরের দিকে রওয়ানা হলেন এবং কাবা ঘরের একপাশে এসে বসলেন।

ইতিমধ্যেই পাঁচজন কাবা শরীফের পাশে নিজ নিজ দরবারস্থলে গিয়ে হাজির হলেন। যুহাইর ইব্ন আবূ উমাইয়া অত্যন্ত জমকালো পোশাক পরে এসে প্রথমে কাবা ঘর তাওয়াফ করলেন। তারপর লোকজনকে সামনে নিয়ে অত্যন্ত জোরদার এক ভাষণ দিলেন।

হে মক্কাবাসী ! আমরা খেয়েপরে মহা সুখে দিনাতিপাত করব, আর বনু হাশিম সমাজচ্যুত হয়ে ধ্বংস হবে, তাদের সাথে ক্রয়-বিক্রয়, লেনদেন পর্যন্ত বন্ধ থাকবে এটা কি হতে পারে ? আল্লাহর কসম ! এ অন্যায় । এ সম্পর্ক বিনষ্টকর হলফনামা এখনই আমি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো না করে ক্ষান্ত হবো না।

তৎক্ষণাৎ আবূ জেহেল এর তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল-তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কসম ! ওটা কিছুতেই ছেঁড়া যাবে না। সাথে সাথেই যামআহ, ইব্ন আসওয়াদ এগিয়ে বললেনঃ 'আল্লাহর কসম ! তুমিই বরং মিথ্যাবাদী। আমরা শুরুতেই এরকম হলফনামায় সম্মত ছিলাম না। সেই সাথে আবুল বোখতারীও বলে উঠলেন, যামআহ ঠিকই বলছে। এতে যা কিছু লিখা হয়েছে আমরা তাতে রাজী নই। এবং স্বীকারও করি না। মুত্বঈম ইব্ন আদী এবার গলা চড়িয়ে বললেন, তোমরা দুজনই সত্য বলেছ। এর উল্টোটা যে বলে, সে-ই বরং মিথ্যুক। আল্লাহর কাছে এ চুক্তির সাথে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করছি। হিশাম ইব্ন আমর এসে একই ঘোষণা প্রদান করলেন।

এবার আবূ জেহেল পুরোদস্তুর হতভম্ব হয়ে গেল। চিৎকার করে বলতে লাগল, এটা চক্রান্ত। নিশ্চয় এরা রাতের আঁধারে সলা-পরামর্শ করে এসেছে। মহা হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল।

এতক্ষণ আবূ তালিব মসজিদের কোণে বসে সব লক্ষ করছিলেন। এবার উঠে বাইরে এলেন। সকলের সামনে গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করলেন, হে মক্কাবাসী ! আমার ভাতিজা আমাকে একটা সংবাদ জানিয়েছেন। তোমরা যে হলফনামা আল্লাহর নামে তৈরী করেছ, তাতে আল্লাহ্ স্বয়ং ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাই তাঁর হুকুমে উইপোকা ওই হলফনামায় লেখা সবকথাই খেয়ে ফেলেছে, শুধু আল্লাহর নামটি ছাড়া। তাই তোমরা আগে দেখ তোমাদের হলফনামার কি পরিণতি। যদি আমার ভাতিজার দেয়া সংবাদ সঠিক হয়, তবে তোমরা তোমাদের এ অন্যায় হলফ পরিত্যাগ করবে। আর যদি তার এ সংবাদ মিথ্যা হয় তবে আমি তাকে তোমাদের হাতে তুলে দেব।

একথায় সমস্ত মক্কাবাসী রাজী হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ মুত্বঈম ইব্ন আদী দ্রুত এগিয়ে কাবার দরজায় লটকানো হলফনামাটি নামিয়ে আনলেন। অবাক হয়ে সকলেই দেখল যে শুধু আল্লাহর নামটি ব্যতীত হলফনামার সবকটি কথাই পোকা খেয়ে ফেলেছ। এখানোই এমনকি করে শেষ হলো এ দুঃসহ কষ্টের। পূর্বোক্ত পাঁচজনের দলটি এ হলফনামা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেন।

মনসূর ইব্ন ইকরামা নামীয় যে পাপিষ্ঠ নিজ হাতে এ হলফনামা লিখেছিল তার হাত পঙ্গু এবং অবশ হয়ে গেল। আমৃত্যু এভাবেই সে জীবণ কাটাল।

আবু তালিব ও হযরত খাদিজা রাঃ এর ইনতেকাল

আবু তালেব ঘাঁটিতে কয়েক বছরের অবরুদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত হওয়ার ছয় মাস পর নবুয়তের দশম বর্ষে রজব মাসে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর চাচা আবু তালেব ইন্তেকাল করেন। (বোখারি আবু তালেবের কিসসা অধ্যায়)। অন্য বর্ণনায় এ কথা উল্লেখ রয়েছে যে, খাদিজা (রা.)-এর ইন্তেকালের তিন দিন আগে রমজান মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন।

আবু তালেবের ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে এলে রাসুলুল্লাহ (সা.) তার কাছে যান। সেখানে আবু জেহেলও উপস্থিত ছিল। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, চাচাজান আপনি শুধু 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলুন- এই স্বীকারোক্তি করলেই আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য সুপারিশ করতে পারব। আবু জেহেল ও আবদুল্লাহ ইবনে উমাইয়া বলল, আবু তালেব, আপনি কি আবদুল মোত্তালেবের ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন? এরপর তারা দু'জন আবু তালেবের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। আবু তালেব শেষ কথা বলেছিলেন যে, আবদুল মোত্তালেবের ধর্মের ওপর...। নবী করিম (সা.) বলেন, আমাকে নিষেধ না করা পর্যন্ত আমি আপনার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকব। এরপর মহান আল্লাহ এই আয়াত নাজিল করেন 'আত্মীয়স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও মোমিনদের জন্য সংগত নয়, যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ওরা জাহান্নামি।' (সুরা তাওবা : ১১৩)।

এ বিষয়ে আল্লাহতায়ালা নিম্নোক্ত আয়াতও নাজিল করেন, 'তুমি যাকে ভালোবাসো ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবে না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন এবং তিনিই ভালো জানেন সৎপথ অনুসারীদের সম্পর্কে।' (সুরা কাসাস : ৫৬)।

খাদিজা (রা.)-এর ইন্তেকাল

আবু তালেবের ইন্তেকালের দুই মাস, অন্য বর্ণনা মতে, তিন দিন পর উম্মুল মুমিমিন খাদিজাতুল কোবরা (রা.) ইহলোক ত্যাগ করেন। নবুয়তের দশম বর্ষের রমজান মাসে তার ইন্তেকাল হয়েছিল। সেই সময় তার বয়স ছিল ৬৫ বছর। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বয়স ছিল ৫০।

খাদিজা (রা.) সিকি শতাব্দী যাবৎ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনসঙ্গী ছিলেন। এ সময় দুঃখণ্ডকষ্ট ও বিপদের সময় প্রিয় স্বামীর জন্য তার প্রাণ কেঁদে উঠত। বিপদের সময় তিনি তাঁকে ভরসা দিতেন, ইসলাম প্রচারে নিত্যসঙ্গী থাকতেন, নিজের জীবন ও সম্পদ দিয়ে তাঁর দুঃখণ্ডকষ্ট দূর করতেন।

দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও মনোবেদনা

এই দুটি দুর্ঘটনা কয়েক দিনের মধ্যেই সংঘটিত হয়েছিল, এতে রাসুল (সা.) শোকে কাতর হয়ে পড়েন। অন্যদিকে আবু তালেবের ওফাতের পর কাফেররা প্রকাশ্যে রাসুল (সা.)-কে

কষ্ট দিতে লাগল। তিনি আশ্রয়ের খোঁজে তায়েফ চলে যান। কিন্তু সেখানে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, আবু তালেবের ইন্তেকালের পর কোরাইশরা নবী করিম (সা.)-এর ওপর এত বেশি নির্যাতন চালিয়েছিল, যা তাঁর জীবদ্দশায় তারা চিন্তাও করতে পারেনি। (ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১৬)। এ ধরনের অত্যাচার-নির্যাতনের কারণে রাসুল (সা.) ওই বছরের নাম রেখেছিলেন আমুল হোজন বা দুঃখের বছর।

সাওদা রা: এর সাথে রাসুল স: এর বিয়ে

নবুওয়ত ১০ম বর্ষের শাওয়াল মাসে রাসুলুল্লাহ (সাঃ)সাওদা বিনতে যাম'আহ (রাঃ)-কে বিবাহ করেন। এ মহিলা নবুওয়তের প্রথম অবস্থাতেই মুসলিম হয়েছিলেন। হাবশের (আবিসিনিয়ায়) দ্বিতীয় হিজরতের সময় হিজরতও করেছিলেন। তাঁর পূর্ব স্বামীর নাম ছিল সাকরান বিন 'আমর। তিনিও প্রথম পর্যায়ের মুসলিম ছিলেন এবং সাওদাহ তাঁর সঙ্গে হাবশা হিজরত করেছিলেন। সাওদাহর স্বামী হাবশে মৃত্যুবরণ করেন। এ কথাও বলা হয়ে থাকে যে, মক্কায় ফিরে আসার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বৈধব্যের পর ইদ্দত পালন শেষ হলে নাবী কারীম (সাঃ)তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। তারপর তাঁরা উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। খাদীজাহ (রাঃ)-এর পর এ মহিলা ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রথম স্ত্রী (বিবাহ পরম্পরায়) দ্বিতীয় স্ত্রী) কয়েক বছর পর ইনি নিজের পালা আয়িশাহ (রাঃ)-কে দান করে দিয়েছিলেন।

তায়েফে রাসুল (সাঃ) এর দাওয়াত

নবুওয়তের দশম বছর রাসুল (সাঃ) দাওয়াতের জন্য তায়েফ গমন করেন। তার সঙ্গী ছিল যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)।রাসূল (সাঃ) তায়েফে দশ দিন অবস্থান করেন। তায়েফে তিনি প্রায় প্রত্যেক নেতাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন তার দাওয়াতে কেউ সাড়া দেয়নি বরং ছোট বাচ্ছাদের তার পিছনে লেলিয়ে দিয়েছে। রাসুল (সাঃ) ফিরার পথে বাচ্ছারা তাকে গালমন্দ ও পাথর ছুড়তে শুরু করে এতে তিনি ও যায়েদ ইবনে হারেসা রা: রক্তাক্ত হয়। অবশেষে তারা রাবী'আহর পুত্র উতবাহ ও শায়বাহর বাগানে আশ্রয় নেয়। তিনি একটি আংগুর গাছের ছায়ায় বসে তাদের জন্য দোয়া করলেন।

اللّٰهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِى، وَقِلَّةَ حِيلَتِي وهَوَانى عَلَى النَّاس يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وأَنْتَ رَبِّي إِلَى مَنْ تَكِلُنِى؟ إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِى؟ أم إلى عَدوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِى؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَىَّ غَضَبٌ فَلاَ أُبَالِى،ولٰكن عَافِيَتُكِ هِى أَوْسَعُ لى، أَعُوذُ بِنُورِ

وَجْهِكَ الَّذِى أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَات، وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنيا وَالآخِرَةِ أَنْتُنَزِّلَ بِي غَضَبُكَ، أَوْ يَحِلُّ علي سَخَطُكَ،لك العُتبى حَتَّى تَرْضَى وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلا بِ

'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার শক্তির দুর্বলতা, অসহায়ত্ব, আর মানুষের নিকট স্বীয় মূল্যহীনতার অভিযোগ প্রকাশ করছি। ওহে দয়াময়, দয়ালু তুমি দুর্বলদের প্রতিপালক, তুমি আমার ও প্রতিপালক, তুমি আমাকে কার নিকট অর্পণ করছো যে, আমার সঙ্গে রুঢ় আচরণ করবে, নাকি তুমি আমাকে এমন শত্রু নিকট ন্যস্ত করছো যাকে তুমি আমার যাবতীয় বিষয়ের মালিক করেছ যাকে তুমি আমার যাবতীয় বিষয়ে মালিক করেছ। যদি তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হও তবে আমারও কোন আফসোস নেই, তবে তোমার ক্ষমা আমার জন্য সম্প্রসারিত করো। আমি তোমার সেই নূরের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যার দ্বারা অন্ধকার দূরীভূত হয়ে চতুর্দিকে আলোয় উদ্ভাসিত হয়। দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় বিষয়ই তোমার উপর ন্যস্ত। তুমি আমাকে অভিসম্পাত করবে কিংবা ধমক দিবে তার থেকে তোমার সন্তুষ্টি আমার কাম্য। তোমার শক্তি ব্যতিরেকে অন্য কোন শক্তি নেই।'
এ দিকে রাবী'আহর পুত্রগণ যখন মহানবী (সাঃ) কে এমন দুরাবস্থায় দেখে তাদের দাস আদ্দাসের হাতে কিছু আংগুর নিয়ে রাসুল (সাঃ) এর কাছে পাঠালেন। তিনি 'বিসমিল্লাহ' বলে তা খাওয়া শুরু করলেন। আদ্দাস বলল এমন কথা তো এ অঞ্চলের লোকদের মুখে কখনো শুনিনি। রাসুল (সাঃ) আদ্দাসকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার বাড়ি কোথায়? সে বললো নিনোভায়। তখন রাসুল (সাঃ)বললেন আপনি পূন্যশীল বান্দা ইউসুফ আ: এর এলাকার অধিবাসী। তাদের মধ্যে আরো কিছু কথা হলো। এরপর তিনি সেখান থেকে বের হয়ে মানায়েল নামক স্থানে আসার পর জিবরাইল আ: আসলেন এবং বললেন আপনি চাইলে তাদেরকে দুই পাহাড় দিয়ে পিষে দিবো। তখন রাসুল স: বললেন না। তাদের মধ্যে ভালো মানুষ আসবে যারা আল্লাহর ইবাদাত করবে।

রাসুল (সাঃ) এর মেরাজ

অধিকাংশ এর মতে নবুওয়তের দ্বাদশ বছর রমজান মাসে মেরাজ সংগঠিত হয়েছে। সেদিন তাকে বুরাকের উপর আরোহন করিয়ে জিবরাঈল আঃ স্বশরীরে মসজিদিল হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়। সেখানে সকল নবীদের ইমাম হয়ে সালাত আদায় করেন। তারপর তাকে ১ম আসমানে নেওয়া হয় সেখানে আদম আ: এর সাথে কথা হয়। এভাবে প্রত্যেক আসমানে একেকজন নবীর সাথে কথা হয় অবশেষে তাকে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী হন তবে আলাহকে স্বচোখে দেখেননি। আল্লাহর সাথে কথা বলের শেষে উম্মতের জন্য পঞ্চাশ

ওয়াক্ত সালাত ফরজ করা হয়েছে। ফেরার পথে মুসা আ: এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি বলেন আপনাকে আল্লাহ কি দিয়েছেন তখন রাসুল স: বলেন পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত। মুসা আ: বলেন আপনার উম্মত পারবেনা কমিয়ে নিয়ে আসেন তখন রাসুল স: আবার গেলে এবং পাচ ওয়াক্ত কমানো হলো এভাবে কয়েকবার যাওয়ার পর রাসুল (সাঃ)লজ্জায় আর গেলেন না তাই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নিয়ে ফিরে আসলেন। সফর থেকে ফিরে আসার সময় রাসুল (সাঃ) কে জিবরাইল আ: জান্নাত, জাহান্নাম সহ অনেক কিছু দেখালেন।

বায়আতে আক্বাবাহ

১ম বায়'আত (البيعة الأولى) যিলহাজ্জ ১১ নববী বর্ষ : ৬জন ইয়াছরেবী যুবকের ইসলাম গ্রহণ)

একাদশ নববী বর্ষের হজ্জের মওসুম (জুলাই ৬২০ খ্রিঃ)। দিনের বেলায় আবু লাহাব ও অন্যান্যদের পিছু লাগা ও পদে পদে অপদস্থ হবার ভয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাত্রির গভীরে দাওয়াতে বের হওয়ার মনস্থ করেন। সেমতে তিনি একরাতে আবুবকর ও আলীকে সাথে নিয়ে বহিরাগত বিভিন্ন হজ্জ কাফেলার লোকদের সঙ্গে তাদের তাঁবুতে বা বাইরে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে থাকেন। এমন সময় তাঁরা মিনার আক্বাবাহ গিরিসংকটের আলো-অাঁধারীর মধ্যে কিছু লোকের কথাবার্তা শুনে তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসায় জানতে পারলেন যে, তারা ইয়াছরিব থেকে হজ্জে এসেছেন এবং তারা ইহূদীদের মিত্র খাযরাজ গোত্রের লোক। তারা ছিলেন সংখ্যায় ছয়জন এবং সকলেই ছিলেন তরতাযা তরুণ। তারা ছিলেন ইয়াছরিবের জ্ঞানী ও নেতৃস্থানীয় যুবকদের শীর্ষস্থানীয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের মধ্যে বসে পড়লেন। অতঃপর তাওহীদের দাওয়াত দিলেন এবং কুরআনের কিছু আয়াত তেলাওয়াত করে শুনালেন। তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল। তারা ইতিপূর্বে ইহূদীদের নিকটে শুনেছিল যে, সত্বর আখেরী নবীর আবির্ভাব ঘটবে। তারা বলত, ... যামানা নিকটবর্তী হয়েছে। এখন একজন নবী আগমন করবেন, যার সাথে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব 'আদ ও ইরাম জাতির ন্যায়' (অর্থাৎ তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলব)। তারা এভাবেই আমাদের হুমকি দিত।ফলে ইনিই যে সেই নবী, এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত হয়ে তখনই ইসলাম কবুল করল।

২য় বায়'আত (البيعة الثانية যিলহাজ্জ ১২ নববী বর্ষ : ১২ জনের ইসলাম গ্রহণ):

গত বছর হজ্জের মওসুমে ইসলাম কবুলকারী ৬ জন যুবকের প্রচারের ফলে পরের বছর নতুন সাত জনকে নিয়ে মোট ১২ জন ব্যক্তি হজ্জে আসেন। গতবারের জাবের বিন আব্দুল্লাহ এবার আসেননি। দ্বাদশ নববী বর্ষের যিলহজ্জ মাসের (মোতাবেক জুলাই ৬২১

খৃঃ) এক গভীর রাতে মিনার পূর্ব নির্ধারিত আক্বাবাহ নামক স্থানে তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই স্থানটিকে এখন জামরায়ে আক্বাবাহ বা বড় জামরাহ বলা হয়। মিনার পশ্চিম দিকের এই সংকীর্ণ পাহাড়ী পথ দিয়ে মক্কা থেকে মিনায় যাতায়াত করতে হ’ত। এই সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ পথকেই ‘আক্বাবাহ’ বলা হয়। এখানেই আইয়ামে তাশরীক্বের এক গভীর রাতে আলো-অাঁধারীর মধ্যে আক্বাবাহ্র অত্র বায়‘আত অনুষ্ঠিত হয়, যা ছিল পরবর্তী পর্যায়ে মাদানী জীবনে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের বীজ বপন সমতুল্য। এই বায়‘আত ছিল মহিলাদের বায়‘আতের ন্যায়। যা তাদের উপর যুদ্ধ ফরয হওয়ার পূর্বে সম্পন্ন হয়েছিল (ইবনু হিশাম ১/৪৩১)।ইতিহাসে এটাই আক্বাবার প্রথম বায়‘আত বা ‘আক্বাবায়ে ঊলা হিসাবে পরিচিত। যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে এটি ছিল ২য় বায়‘আত।তারা সকলে নবী সাঃ এর কাছে বায়াত গ্রহণ করেন।মক্কার মুশরিকদের জুলুম নির্যাতন উপেক্ষা করে মদিনায় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষে হজ্জের মৌসুমে ইয়াসরিবের আরো ৭০ জনেরও অধিক মুসলিম ফরজ হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন। তারাও নবী করীম সাল্লাল্লাহু সালামের কাছে বায়াত গ্রহণ করেন। বায়াত গ্রহণের পর তারাও নবী কারীম (সাঃ) কে মদিনায় আমন্ত্রণ জানান।এদিকে মক্কায় মুসলিমদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি করা হয়। রাসুল স: মুসলিমদের মদিনায় হিজরত করার আদেশ দেন। এরপর রাসুল স: কে হত্যা করার জন্য মুশরিকরা সভার আয়োজন করে। রাসুল স: কে নিয়ে বিভিন্ন প্রস্তাবের পর আবু জাহেল প্রস্তাব করে সকল গোত্র থেকে একজন করে একত্রিত হয়ে তাকে হত্যা করা হবে এতে বনু আবদে মান্নাফ সব গোত্রের সাথে যুদ্ধ করতে পারবেনা। তার কথায় সবাই একমত হলো।এই সময়ে মহানবী সাঃ কে আল্লাহ হিজরতের অনুমতি প্রদান করেন।

রাসুল স: এর মদিনায় হিজরত

মক্কা থেকে মদিনায় নবীজি (সা.)-এর হিজরত ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কেননা এর মাধ্যমে ইসলামের নবযাত্রা শুরু হয়েছিল। মক্কার সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে মুসলমানরা মুক্ত পরিবেশে স্বস্তির নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগ লাভ করেছিল। ইসলামী সমাজ ও সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল পবিত্র নগরী মদিনায়।
আল্লাহর রসূল (ﷺ) মুসলমানদেরকে মদ্বীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। মুসলিমগণ দ্রুত মদ্বীনায় হিজরত করতে লাগলেন। আবু সালামা এবং তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা সর্বপ্রথম মদ্বীনার পথে বের হলেন। কিন্তু আবু সালামার শ্বশুর গোত্রের লোকেরা এসে উম্মে

সালামাকে এবং শিশু সন্তান সালামাকে আটকিয়ে দিল। ঐ দিকে আবু সালামার গোত্রের লোকেরা এসে উম্মে সালামার কাছ থেকে নিজেদের গোত্রের সন্তান দাবী করে তারাও সালামাকে ছিনিয়ে নিল। আবু সালামা কঠিন ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন এবং স্ত্রী-সন্তান ফেলে একাই মদ্বীনায় চলে গেলেন। এক বছর পর উম্মে সালামা তার শিশু সন্তান নিয়ে মদ্বীনায় হিজরত করলেন। উছমান বিন আবু তালহা তাকে মদ্বীনায় পৌঁছিয়ে দিলেন।আবু সালামার পথ ধরে লোকেরা একের পর এক মদ্বীনায় হিজরত করতে থাকল। এক পর্যায়ে মক্কাতে রসূল (ﷺ), আবু বকর এবং আলী (রাঃ) ব্যতীত অন্য কোন মুসলিম অবশিষ্ট রইলনা। আবু বকর ও আলী রসূল (ﷺ)-এর আদেশেই মক্কায় রয়ে গেলেন। এ ছাড়া যে সমস্ত মুসলিমকে কুরাইশরা আটকিয়ে রেখেছিল তারাও রয়ে গেলেন। রসূল (ﷺ) হিজরতের জন্য প্রস্তুত হয়ে আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় ছিলেন। আবু বকরও প্রস্তুত ছিলেন।

সহীহ বোখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের বললেন, আমাকে তোমাদের হিজরতের স্থান দেখানো হয়েছে এটি হচ্ছে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি এলাকা এরপর মুসলমানরা মদিনায় হিজরত শুরু করেন, হাবশায় যারা হিজরত করেছিলেন তারাও মদিনায় আসতে শুরু করেন, হযরত আবু বকর (রা) ও মদিনায় সফরের প্রস্তুতি নেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, অপেক্ষা কর, আমি ধারনা করছি যে, আমাকেও হিজরতের নির্দেশ দেয়া হবে হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আমার মা-বাবা আপনার জন্য কোরবান হোক, আপনি কি হিজরতের আশা করছেন? প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন হা, এরপর হযরত আবু বকর (রা.) অপেক্ষা করতে লাগলেন, তিনি প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সফরসঙ্গী হবেন এ আশায় ছিলেন তার কাছে দুটি উটনী ছিল, তাদেরকে চার মাস যাবত ভালো করে বাচলা গাছের পাতা খাওয়ানো হল (সহীহ বোখারী, হিজরতে নবী অধ্যায়, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৫৩)।

রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার জঘন্য প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর হযরত জিবরাঈল (আ.) ওহী নিয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাজির হন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোরাইশদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করে বলেন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে মক্কা থেকে হিজরত করার অনুমতি দিয়েছেন, হিজরত করার সময় জানিয়ে হযরত জিবরাঈল (আ.) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন আপনি আজ রাত আপনার বাসভবনের বিছানায় শয়ন করবেন না (হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৮০-৪৮২, যাদুল মায়াদ ২য় খন্ড, পৃ. ৫২)।

এ খবর পাওয়ার পর নবী ঠিক দুপুরের সময় হযরত আবু বকর (রা.)এর বাড়ীতে গেলেন তাকে সঙ্গে নিয়ে হিজরতের পরিকল্পনা তৈরি করাই ছিল তার উদ্দেশ্য, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন ঠিক দুপুরের সময় আমরা আবু বকর (রা.) এর ঘরে বসেছিলাম, এমন সময় একজন আবু বকরকে বললেন, আল্লাহর নবী মাথা ঢেকে এদিকে আসছেন, এই সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখন আসতেন না, আবু বকর (রা.) এ খবর শুনে বললেন, আমার মা বাবা তার জন্য কোরবান হউন, নিশ্চয়ই তিনি গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজে এসেছেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, প্রিয় নবী এলে ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন, অনুমতি দেয়া হলে তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন এরপর আবু বকরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন তোমার কাছে যারা রয়েছে তাদের সরিয়ে দাও, আবু বকর (রা.) বললেন শুধু আপনার স্ত্রী রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন আমাকে রওয়ানা হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে, আবু বকর (রা.)রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন সঙ্গে আমি? হে রাসূল আপনার ওপর আমার মা বাবা কোরবান হউন, হে আল্লাহর রাসূল, প্রিয় রাসূল বলেন হা (যাদুল মায়াদ ১য় খন্ড)। এরপর হিজরতের কর্মসূচী তৈরি করে তিনি নিজের ঘরে ফিরে রাত্রির অপেক্ষা করতে লাগলেন (সহীহ বোখারী হিজরতে নবী অধ্যায়, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৫৩)।

ইবনে ইসহাক বলেন, রাতের আধার ঘন হয়ে এলে ১১জন দুর্বৃত্ত নবী (সা.) এর বাসভবনের চারিদিকে ওৎ পেতে রইল, তারা অপেক্ষা করছিল যে, তিনি শুয়ে পড়লে একযোগে হামলা করবে।ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল রাত বারোটার পর, এ কারণে নির্ঘুম চোখে নির্ধারিত সময়ের প্রতীক্ষায় তারা অপেক্ষা করছিল, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তার ইচ্ছাই সফল করে থাকেন তিনি আসমান যমীনের বাদশাহ, তিনি যা চান তাই করেন তিনি যাকে বাচাতে চান কেউ তার ক্ষতি করতে পারে না যাকে পাকড়াও করতে চান কেউ তাকে বাচাতে পারে না এই সময়েও আল্লাহ তায়ালা যা ইচ্ছা করেছিলেন তাই করলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে তিনি বলেন স্মরণ কর, কাফেররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী করার জন্য হত্যা করার জন্য নির্বাসিত করার জন্য তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও কৌশল করেন আর আল্লাহরই কৌশলীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ (সূরা আনফাল, আয়াত ৩০)।কোরাইশ কাফেররা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চূড়ান্ত প্রস্তুতি এবং সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও সফল হতে পারেনি, এমনি এক নাজুক পরিস্থিতিতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রা.) কে বললেন তুমি আমার এই সবুজ হাদরামি (দক্ষিণ ইয়েমেনের হাদরামাউতে নির্মিত চাদরকে হাদরামি চাদর বলা হয়) চাদর গায়ে দিয়ে আমার বিছানায় শুয়ে থাক,

ওদের হাতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না, প্রিয় নবী এই চাদর গায়ে দিয়ে রাতে ঘুমোতেন (ইবনে হিশাম ১ম খন্ড, পৃ. ৪৮২, ৪৮৩)।
আল্লাহর রাসূল এরপর বাইরে এলেন একমুঠো ধুলো নিয়ে কাফেরদের প্রতি নিক্ষেপ করলেন, এতেই আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্ধ করে দিলেন, তারা আল্লাহর রাসূলকে দেখতে পেল না, সে সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাক কোরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন, আমি ওদের সামনে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করেছি এবং ওদেরকে আবৃত্ত করেছি, ফলে ওরা দেখতে পায় না (সূরা ইয়াসিন, আয়াত ৯)।
প্রতিটি পৌত্তলিকের মাথায় নিক্ষিপ্ত ধূলি গিয়ে পড়লো, এরপর তিনি হযরত আবু বকরের বাড়ীতে গেলেন, সেই ঘরের একটি জানালা পথে বেরিয়ে উভয়ে মদিনার উদ্দেশ্যে ইয়েমেনের পথে যাত্রা করলেন, রওয়ানা হওয়ার পর কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত ছুর পাহাড়ের একটি গুহায় তারা যাত্রা বিরতি করলেন (ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৮৩ যাদুল মায়াদ ২য় খন্ড, পৃ. ৫২)।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন যে, কোরাইশ দুর্বৃত্তরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় তাকে খুঁজবে এবং স্বাভাবিকভাবে মদিনা অভিমুখী পথের দিকেই অগ্রসর হবে এ কারণে প্রিয় নবী উল্টো দিকে ইয়েমেনের পথে অগ্রসর হলেন, মদিনার পথ হচ্ছে মক্কা থেকে উত্তর দিকে আর ইয়েমেনের পথ দক্ষিণ দিকে পাঁচ মাইল অতিক্রমের পর প্রিয় নবী একটি পাহাড়ের পাদদেশে পৌছলেন, সেই পাহাড় ছুর পাহাড় নাম পরিচিত, একটি সুউচ্চ পাহাড় এই পাহাড়ে ওঠা খুব কষ্টকর এখানে বহু পাথর রয়েছে সেই পাথর পাড়ি দিতে গিয়ে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরণ যুগল রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল, বলা হয়ে থাকে যে, পায়ের ছাপ গোপন রাখার জন্য তিনি পায়ের গোড়ালি দিয়ে হাটছিলেন, এ কারণে তার পা জখম হয়ে যায়।
হযরত আবু বকর (রা.) প্রথমে পাহাড়ের কিছু অংশে উঠে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওপরে উঠতে সহায়তা করেন, এরপর উভয়ে পাহাড় চুড়ার একটি গুহায় আশ্রয় নেন এই গুহা ইতিহাসে গারে ছূর নামে বিখ্যাত (রহমতুল লিল আলামিন, ১ম খন্ড, পৃ. ৯৫, মুখতাছারুছ সিরাহ শেখ আবদুল্লাহ পৃ. ১৬৭৭, ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৮২)।
গুহার কাছে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবু বকর (রা.) বললেন, একটু অপেক্ষা করুন, গুহায় কোন কিছু থাকলে তার মোকাবেলা আমার সাথেই যা হবার হবে, এরপর তিনি গুহায় প্রবেশ করে পরিষ্কার করলেন, কয়েকটি গর্ত ছিল, যেগুলো তহবন্ধ ছিড়ে বন্ধ করলেন, দুটি গর্ত বাকি ছিল, সেগুলোতে পা চাপা দিয়ে প্রিয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভেতরে আসার আহ্বান জানালেন, প্রিয় নবী ভেতরে গেলেন এবং আবু বকরের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন, ইতিমধ্যে হযরত আবু বকর

(রা.) কে কিসে যেন দংশন করল, কিন্তু প্রিয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে এ আশঙ্কায় তিনি নড়াচড়া করলেন না, বিষের কষ্টে তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো, বেখেয়ালে এক ফোটা অশ্রু প্রিয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারায় পড়তেই তিনি জেগে গেলেন, আবু বকর (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি হয়েছে? কিসে যেন আমাকে দংশন করেছে ।

এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খানিকটা থুথু নিয়ে দংশিত স্থালে লাগিয়ে দিলেন সাথে সাথে বিষের যাতনা দূর হয়ে গেল (এই বক্তব্য ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)থেকে বর্ণনা করা হয়েছে এ বর্ণনায়, একথাও রয়েছে যে, পরবর্তী সময়ের সেই বিষের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং সেই বিষের প্রভাবেই তিনি ইন্তিকাল করেন, দেখুন মেশকাত, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৫৬, মানাকের আবু বকর শীর্ষক অধ্যায়)।

এখানে উভয়ে শুক্র, শনি ও রবিবার এ তিনদিন অবস্থান করেন (ফতহুল বারী, ৭ম খন্ড, পৃ. ৩৩৬) এ সময়ে হযরত আবু বকরের পুত্র আবদুল্লাহও একই সঙ্গে রাত্রি যাপন করেন, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন আবদুল্লাহ ছিল খুব বুদ্ধিমান যুবক, সে শেষ রাতে উভয়ের কাছে থেকে চলে আসতো কিন্তু মক্কায় তাকে সকাল বেলাই দেখা যেত, যে কেউ দেখে ভাবত রাতে সে মক্কাতেই ছিল, সারাদিন উভয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের যেসব কথা শুনতো, সন্ধ্যায় অন্ধকার ঘনিয়ে এলে সেসব খবর নিয়ে গারে ছূরে চলে যেত।

এদিকে হযরত আবু বকরের ক্রীতদাস আমের ইবনে যোহায়রা বকরি চরাতেন রাতের আধার গভীর হলে তিনি বকরি নিয়ে তাদের কাছে যেতেন এবং দুধ দোহন করে দিতেন, উভয়ে তৃপ্তির সাথে দুধ পান করতেন খুব ভোরে আমের বকরি নিয়ে রওয়ানা হতেন তিন রাতেই তিনি এরূপ করেছিলেন (সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৫৩-৫৫৪) এ ছাড়া আমের ইবনে যোহায়রা আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকরের মক্কা যাওয়ার চিহ্ন সেই পথে বকরী তাড়িয়ে মুছে দিতেন (ইবনে হিশাম, ১ম খ

অনুসন্ধানকারীরা ছুর পাহাড়ের গুহার কাছেও পৌঁছল, কিন্তু সারা দুনিয়ার বাদশাহ আল্লাহ তায়ালা নিজের ইচ্ছাকেই পূর্ণতা দান করেন, সহীহ বোখারীতে হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গুহায় ছিলাম, মাথা তুলতেই দেখি, লোকদের পা দেখা যাচ্ছে, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল ওরা কেউ যদি একটুখানি নিচু হয়ে এদিকে তাকায় তবেই আমাদের দেখতে পারবে, প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আবু বকর চুপ কর, আমরা এখানে দুজন নই বরং আমাদের সাথে তৃতীয় হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আবু বকর এমন দুজন সম্পর্কে তোমার কি ধারনা, যাদের তৃতীয় হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা (সহীহ

বোখারী ১ম খন্ড, পৃ. ৫১৬ ৫৫৮ এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, হযরত আবু বকরের অস্থিরতা নিজের জীবন রক্ষার জন্য ছিল না, তিনি প্রিয় নবী (সা.) এর জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন, তিনি দুর্বৃত্তদের পা দেখতে পাচ্ছিলেন, সে সময় তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন এবং বললেন, যদি আমি মারা যাই তবে একজন আবু বকর মারা যাবে, কিন্তু আপনি মারা গেলে সমগ্র উম্মত বরবাদ হয়ে যাবে, এ সময়ে রাসূল বলেছিলেন ভয় পেয়ো না, আবু বকর আল্লাহ পাক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন)।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আবু বকর (রা.) মদিনার পথে রওয়ানা হলেন, বিভিন্ন পথ সম্পর্কে অভিজ্ঞ আবদুল্লাহ ইবনে আরিকত লাইছির সাথে আগেই চুক্তি হয়েছিল যে তিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এই দুইজনকে মদিনায় পৌঁছে দেবেন, কোরাইশদের ধর্ম বিশ্বাসের ওপর থাকলেও এ লোকটি ছিল বিশ্বস্ত, এ কারণে তাকে সওয়ারীও দেয়া হয়েছিল, তাকে বলা হয়েছিল যে, তিনদিন পর সে দুটি সওয়ারীসহ ছুর গুহার সামনে যাবে, সোমবার রাতে ১লা রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১৬ই সেপ্টেম্বর ৬২২ ঈসায়ী সালের সোমবার রাতে আবদুল্লাহ ইবনে আরিকত সওয়ারী নিয়ে এলেন হযরত আবু বকর (রা.) এসময় তার দুটি উটনী দেখিয়ে বললেন, হে রাসূল আপনি এ দুটির মধ্যে একটি গ্রহণ করুন, রাসূল বললেন, হা, তবে মূল্যের বিনিময়ে এদিকে আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) উটের ওপর বিছানোর বিছানা নিয়ে এলেন কিন্তু বাধার দড়ি আনতে ভুলে গিয়েছিলেন, রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আসমা উটের পিঠে বিছানা রাখার পর দেখা গেল বাধার দড়ি রেখে এসেছেন, তিনি তখন নিজের কোমরবন্দ খুলে সেটি দুভাগ করে ছিড়ে বিছানা উঠের পিঠের সাথে বেধে দিলেন অন্য অংশ নিজের কোমরে বাধলেন, এ কারণে তার উপাধি হয়েছিল যাতুন নেতাকাইন (সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৫৩-৫৫৫, ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৮৬)।

এরপর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আবু বকর (রা.)রওয়ানা হলেন, আমের ইবনে যোহায়রাও সঙ্গে ছিলেন, রাহবার আব্দুল্লাহ ইবনে আরিকত উপকূলীয় পথে মদিনা রওয়ানা হলেন।

গারে ছুর থেকে বেরবার পর আবদুল্লাহ প্রথমে ইয়েমেনের দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে বহুদূর অগ্রসর হলেন এরপর পশ্চিমাভিমুখী হয়ে সমুদ্রোপকূল ধরে যাত্রা করলেন, পরে এমন এক পথে চলতে লাগলেন যে পথ সম্পর্কে সাধারণ লোকেরা কেউ অবহিত ছিল না, সে পথে উত্তর দিকে অগ্রসর হলেন লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী এ পথে খুব কম সময়েই লোক চলাচল করত।

সহীহ বোখারী শরীফে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন গারে ছুর থেকে বেরিয়ে আমরা সারারাত ধরে পথ চলেছি পরদিন দুপুর পর্যন্তও চলেছি ঠিক দুপুরের রাস্তায় কোন পথচারী ছিল না, আমরা এ সময় একটা লম্বালম্বি প্রান্তর দেখতে

পেলাম এখানে রোদ নেই আমরা সেখানে অবতরণ করলাম নিজের হাতে আমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শয়নের জন্য একটি জায়গা সমতল করলাম, এরপর সেখানে চাদর বিছালাম, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরপর বললাম, হে আল্লাহর রাসূল আপনি শয়ন করুন, বিশ্রাম নিন, আমি আশেপাশে খেয়াল রাখছি, নবীজি শুয়ে পড়লেন, আমি চারিদিকে নজর রাখলাম হঠাৎ দেখি একজন রাখাল কিছু সংখ্যক বকরি নিয়ে এদিকেই আসছে, সে প্রান্তরের ছায়ায় আসছিল, আমি তাকে বললাম, তোমার বকরির কি কিছু দুধ হবে? সে বলর হ্যাঁ, আমি বললাম, দোহন করতে পারি? সে বলল হ্যাঁ, এ কথা বলে সে একটি বকরি ধরে আনল, আমি বললাম মাটি খড়কুটো এবং লোম থেকে ওলান একটু পরিষ্কার করে দাও, পরিষ্কার করার পর একটি পেয়ালায় কিছু দুধ দোহন করে দিল, আমার কাছে ছিল একটি চামড়ার পাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওযু এবং পানি পান করার জন্য সেটি রেখেছিলাম, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে দেখি তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন তাকে জাগানো সমীচীন মনে করলাম না, কিছুক্ষণ পর তিনি ঘুম থেকে জাগলেন, দুধের সাথে কিছু পানি মেশালাম, এতে পাত্রের নীচের অংশ ঠান্ডা হয়ে গেল, তাকে বললাম আপনি এ দুধটুকু পান করুন তিনি পান করে খুশী হলেন, এরপর বললেন, এখনো কি রওয়ানা হওয়ার সময় আসেনি? আমি বললাম কেন নয়? এরপর আমরা আবার রওয়ানা হলাম (সহীহ বোখারী ১ম খন্ড, পৃ. ৫৫৬)।

দুই) এ সফরের সময় হযরত আবু বকর (রা.)রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে বসতেন, পথচারীদের দৃষ্টি তার দিকেই প্রথমে যেত, কারণ তার চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ ছিল, তার তুলনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কমবয়সী মনে হচ্ছিল, পথচারীদের কেউ যখন জিজ্ঞাসা করত যে, আপনার সামনে উনি কে? হযরত আবু বকর (রা.) জবাব দিতেন যে, উনি আমাকে পথ দেখান, প্রশ্নকারী বুঝতো যে মরুভূমিতে পথ দেখাচ্ছেন, প্রকৃতপক্ষে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) নেকী ও কল্যাণের পথের কথাই বোঝাতেন (সহীহ বোখারী ১ম খন্ড, পৃ. ৫৫৬)।

তিন) এই সফরের সময় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে মাবাদ খোযায়ার তাবুতে কিছুক্ষণের জন্য যাত্রা বিরতি করেন, এই মহিলা খুব বুদ্ধিমতী নিজের বাড়ীতে আঙ্গিনায় তিনি বসেছিলেন, যাতায়াতকারী পথচারীদের সাধ্যমত পানাহার করাতেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে কিছু আছে? মহিলা বললেন, যদি কিছু থাকতো তবে আপনাদের মেহমানদারিতে ক্রুটি করতাম না, কয়েকটি বকরি আছে, যগুলো দূরে চারণভূমিতে রয়েছে, এখন দুর্ভিক্ষের সময় চলছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লক্ষ্য করলেন যে, বাড়ীর এক পাশে একটি বকরি বাধা আছে, তিনি বললেন, উম্মে মাবাদ, এ বকরি এখানে কেন? উম্মে মাবাদ বললেন, এ বকরি খুব দুর্বল, হাটতে পারে না, প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, অনুমতি যদি দাও, তবে ওর দুধ দোহন করি? মহিলা বললেন, হা, যদি দুধ দেখতে পান, অবশ্যই দোহন করুন একথার পর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বকরির ওলানে হাত লাগালেন আল্লাহর নাম নিলেন এবং দোয়া করলেন বকরি সাথে সাথে পা প্রসারিত করে দাড়াল, তার ওলানে ভরা দুধ, প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বড় পাত্র নিয়ে সেই পাত্রে দুধ দোহন করলেন, সেই পাত্র ভর্তি দুধ এক দল লোক তৃপ্তির সাথে পান করতে পারতো, দুধ দোহনের পর পাত্রে ফেনা ভরে গেল, সঙ্গীদের পান করালেন উম্মে মাবাদ নিজে পান করলেন, এরপর সেই পাত্রে পুনরায় দুধ দোহন করলেন, সেই পাত্র ভর্তি দুধ উম্মে মাবাদের ঘরে রেখে আল্লাহর রাসূল গন্তব্যের দিকে রওয়ানা হলেন।

কিছুক্ষণ পর মহিলার স্বামী বকরির পাল নিয়ে বাড়ী ফিরলো, সেসব বকরিও দুর্বল, পথ চলতে ক্লান্তিতে হাঁপিয়ে ওঠে উম্মে মাবাদের স্বামী আবু মাবাদ দুধ দেখে তো অবাক! জিজ্ঞাসা করলেন, দুধ পেলে কোথায়? সব দুগ্ধবতী বকরি তো আমি চারণ ভূমিতে নিয়ে গেছি, ঘরে তো দুধ দেয়ার মত বকরি ছিল না, উম্মে মাবাদ বললেন, আমাদের কাছে একজন বরকত সম্পন্ন মানুষ এসেছিলেন তার কথা ছিলো এমন এবং তার অবস্থা ছিল এমন, সব শুনে আবু মাবাদ বললেন, এই তো মনে হয় সেই ব্যক্তি, যাকে কোরাইশরা খুঁজে বেড়াচ্ছে, আচ্ছা তুমি তার আকৃতি প্রকৃতি একটু বল, উম্মে মাবাদ অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিচয় বর্ণনা করলেন, সে বর্ণনা ভঙ্গি শুনে মনে হয় শ্রোতা যেন তাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, গ্রন্থের শেষ দিকে এইসব বিবরণ উল্লেখ করা হবে, আগন্তুকের ভূয়সী প্রশংসা শুনে সে বলল, আল্লাহর শপথ এই হচ্ছে কোরাইশদের সেই ব্যক্তি, যার সম্পর্কে লোকেরা না কথা বর্ণনা করেছে, আমার ইচ্ছা হতে তার প্রিয় সঙ্গীদের একজন হব, যদি কোন পথ পাই তবে অবশ্যই এটা করবো।

নবুয়তের চতুর্দশ বছরের ৪ই রবিউল আউয়াল অর্থাৎ ১লা হিজরি মোতাবেক ২৩শে সেপ্টেম্বর ৬২২ ঈসায়ী সালের সোমবার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোবায় অবতরণ করেন (রহমতুল লিল আলামীন ১ম খন্ড, পৃ. ১০২ সেই তারিখে প্রিয় রাসূল (সা.) এর বয়স পুরোপুরি তেপ্পান্ন বছর পূর্ণ হয়েছিল, যারা হস্তী যুদ্ধের ঘটনার বছর হিসেবে ৯ই রবিউল আউয়াল ৪১ সালের হিসাবে নবুয়তের হিসাব করেন, তাদের হিসাব মতে এ তারিখে নবুয়তের ১৩ বছর পূর্ণ হয়েছিল, আর যারা হস্তী যুদ্ধের ঘটনার হিসাব ৪৯

সালের রমযান মাসে তার নবুয়তের শুরু মনে করেন, তাদের হিসাব অনুযায়ী এ তারিখে তার নবুয়তের বয়স ১২ বছর ৫ মাস ১২ দিন বা ২২ দিন)।

হযরত ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রা.) বলেন, মদিনার মুসলমানরা মক্কা থেকে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওয়ানা হওয়ার খবর জেনেছিলেন এ কারণে মদিনার বাইরে হাররার নামক স্থানে এসে প্রতিদিন তারা অপেক্ষা করতেন দুপুরের রোদ অসহ্য হয়ে উঠলে ফিরে যেতেন একদিন এমনি করে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সবাই ঘরে ফিরে গেছেন এ সময় একজন ইহুদী ব্যক্তিগত কাজে একটি টিলার উপর উঠেছিল, হঠাৎ সে সাদা কাপড়ের তৈরি চাঁদোয়া লক্ষ্য করল, আনন্দের আতিশয্যে সে চিৎকার করে বলতে লাগল, শোন মুসলমানরা, শোন, তোমরা যার জন্যে প্রতিদিন অপেক্ষা করছিলে, তিনি আসছেন একথা শোনা মাত্রই মুসলমানরা ছুটে এল এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাদের প্রাণপ্রিয় নেতাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বেরিয়ে পড়ল (সহীহ বোখারী ১ম খন্ড, পৃ. ৫৫৫)।

ইবনে কাইয়েম বলেন, ঘোষণার সাথে সাথে বনি আমর ইবনে আওফের মধ্যে শোরগোল পড়ে গেল এবং তকবির ধ্বনি শোনা গেল, মুসলমানরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অভ্যর্থনা জানালো এবং চারপাশে ভিড় করতে লাগল, সে সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন নীরব, তার ওপর তখন কোরআনের এই আয়াত নাযিল হচ্ছিল, কিন্তু তোমরা যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে একে অপরের পৃষ্ঠপোষকতা কর, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ তায়ালাই তার বন্ধু, জিবরাঈল ও সৎকর্মপরায়ন মোমেনরা উপরন্তু অন্যান্য ফেরেশতারাও তার সাহায্যকারী, (সুরা তাহরীম, আয়াত ৪)।

হযরত ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রা.) বলেন, লোকদের সাথে মিলিত হওয়ার পর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে ডানদিকে অগ্রসর হলেন এবং বনি আমর ইবনে আওফের বাড়ি অভিমুখে রওয়ানা হলেন, এ দিন ছিল সোমবার, মাস ছিল রবিউল আউয়াল, হযরত আবু বকর (রা.) আগন্তুকদের অভ্যর্থনা জন্য দাঁড়িয়েছিলেন, আর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপচাপ বসেছিলেন।

আনসারদের মধ্যে যারা ইতিপূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেননি তারা হযরত আবু বকর (রা.) কে সালাম করছিলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গায়ের উপর ঢলে পড়া সূর্যের কিরণ এসে পড়লে হযরত আবু বকর (রা.) একখানি চাদর দিয়ে তাকে ছায়া করে দাঁড়ালেন, এতে সবাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনতে পারলেন(সহীহ বোখারী ১ম খন্ড, পৃ. ৫৫৫)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোবায় মোট চারদিন (এটা ইবনে ইসহাকের বর্ণনা, ইবনে হিশাম ১ম খন্ড, পৃ. ৪৯৪ দেখুন, এই বর্ণনাই আল্লামা মনসুরপুরী গ্রহন করেছেন,

রহমতুল লিল আলামীন ১ম খন্ড, পৃ. ১০২, কিন্তু সহীহ বোখারীর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, প্রিয় রাসূল সেখানে ২৪ রাত অবস্থান করেন, ১ম খন্ড, পৃ. ৬১। এ সময়ে তিনি মসজিদে কোবার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন এবং সেই মসজিদে নামায আদায় করেন, নবুয়ত প্রাপ্তির পর এটি ছিলো প্রথম মসজিদ, তাকওয়ার ওপর এই মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল।পঞ্চম, দ্বাদশ বা ২৬ তম দিনের শুক্রবারে তিনি আল্লাহর নির্দেশে সওয়ারীর ওপর আরোহণ করেন, রওয়ানা হওয়ার আগে তিনি তার মামার গোত্র বুন নাজ্জাহকে খবর পাঠালে তারা তলোয়ার সজ্জিত হয়ে হাজির হল, তিনি তাদের সাথে নিয়ে মদিনার পথে রওয়ানা হলেন, বনু সালেম ইবনে আওফের জনপদে পৌছার পর জুমার নামাযের সময় হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকালয়ে জুমার নামায আদায় করলেন, জুমার জামাতে একশ মুসল্লি হাযির হয়েছিলেন (সহীহ বোখারী ১ম খন্ড, পৃ. ৫৫৫, ৫৬০ যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৫ ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৯৪ রহমাতুল লিল আলামীন ১ম খন্ড, পৃ. ১০২), এখনো সেখানে এ মসজিদ রয়েছে।জুমার নামায আদায়ের পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনা গমন করেন, সেদিন থেকে ইয়াসরেবের নাম হয়েছে মদীনাতুর রাসূল, বা শহরে রাসূল সংক্ষেপে মদিনা এই দিন ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় দিন চারদিকে আল্লাহর প্রশংসা ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল আনসার শিশুরা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে এ গান গাইছিল।আনসাররা ধনী বা বিত্তশালী ছিলেন না, কিন্তু সবাই চাচ্ছিলেন যে, নবী তার বাড়ীতেই অবস্থান করবেন, যে এলাকা দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন সেখানের লোকেরাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উটের রশি ধরে তার বাড়ীতে আসার আবেদন জানাতেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে দিলেন যে, উটনীর পথ ছেড়ে দাও, সে আল্লাহর তরফ থেকে আদেশ পেয়েছে এরপর উটনী ইচ্ছামত চলতে লাগলো এবং বর্তমানে যেখানে মসজিদে নববী রয়েছে সেখানে গিয়ে থামল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটনী থেকে নামলেন না, উটনী সামনে কিছুদূরে এগিয়ে গেল, এরপর পুনরায় ঘুরে আগের জায়গায় ফিরে এসে বসে পড়ল এটা ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নানাদের মহল্লা অর্থাৎ বনু নাজ্জারদের মহল্লা উটনীকে আল্লাহর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়ায় সে বনু নাজ্জার এলাকায় থেমে নানাদের প্রতি সম্মান দেখিয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও মনে মনে এটাই চাচ্ছিলেন এবার বনু নাজ্জার গোত্রের লোকেরা নিজ নিজ বাড়ীতে নিয়ে তাকে যাওয়ার জন্য আবেদন নিবেদন শুরু করল, আবু আইয়ুব আনসারী এগিয়ে এসে উটের লাগাম ধরলেন এবং তার বাড়ীতে নিয়ে গেলেন, এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মানুষ তার উটের পালানের সঙ্গে রয়েছে এরপর হযরত আসআদ ইবনে যোরারাহ এসে উটনীর লাগাম ধরলেন উটনী তখন থেকেই তার নিয়ন্ত্রণেই থাকল (যাদুল মায়াদ ২য় খন্ড, পৃ. রহমাতুল

লিল আলামীন ১ম খন্ড, পৃ. ১০৬)।কয়েকদিন পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী উম্মুল মোমেনীন হযরত সাওদা, দুই কন্যা ফাতেমা ও উম্মে কুলসুম, ওসামা ইবনে যায়েদ এবং উম্মে আরমানও এসে পড়লেন, এদের সবাইকে হযরত আবু বকরের পরিবারের সাথে আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর মদিনায় নিয়ে আসেন, হযরত আয়েশা (রা.) ও এদের সঙ্গে ছিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক কন্যা হযরত যয়নব হযরত আবুল আস এর কাছে রয়ে গেলেন, তিনি তখন আসতে দেননি, তিনি বদরের যুদ্ধের পর আগমন করেন (যাদুল মায়াদ ২য় খন্ড, পৃ. ৫৫)।

বদরের যুদ্ধ

কুরাইশদের ষড়যন্ত্র ও হুমকি অব্যাহত থাকায় রাসুল স: খুব সতর্ক ছিলেন। কুরাইশদের একটি বানিজ্য কাফেলা মক্কা থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে রাসুল স: ঘোষণা করলেন এ কাফেলার লক্ষ্যে তোমরা বেরিয়ে পড়। বদরের উদ্দেশ্যে মতান্তরে ৩১৩ জন সাহাবী নিয়ে রাসুল স: রওনা হয়েছেন। কোরাইশদের বানিজ্য কাফেলার নেতৃত্বে ছিলেন আবু সুফিয়ান। আবু সুফিয়ান মুসলমানদের আক্রমণের খবর পেয়ে জামজাম ইবনে আমর কে মক্কায় পাঠিয়ে তাদের রক্ষা করার জন্য আবেদন জানান। মক্কাবাসী প্রস্তুতি নিয়ে রওনা করে। অমুসলিমরা দলে দলে বেরিয়ে এল এবং উভয় দল মুখোমুখি হতে শুরু করল। রাসুল স: দোয়ার বরকতে আল্লাহ তায়ালা এই যুদ্ধে ফেরেস্তা দিয়ে মুসলমানদের সাহায্য করলেন। ইবলিশ ছোরাকা ইবনে মালেক এর রুপ ধরে কাফেরদের সাহায্য করতে এসেছিল কিন্তু সে ফেরেস্তাদের দেখে পালায়ন করে। এই যুদ্ধে আবু জাহেলসহ কাফেরদের ৭০ জন নেতা মারা যায়। আর মুসলমানদের ১৪ জন শহিদ হয়েছে। এই যুদ্ধে মুসলমানদের জয় হয়।

ওহুদের যুদ্ধ

বদরের যুদ্ধে পরাজয়ের অবমাননা কারনে কাফেররা ওহুদের যুদ্ধের ঘোষণা দেন। তারা মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা করেন। রাসুল স: খবর পাওয়ার পর তাদের প্রতিহত করার জন্য মুসলমানদের প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন। তারা যখন ওহুদ পাহাড়ের নিকটে অবস্থান নিল অথন রাসুল স: মজলিসে শুরার সভা ডাকলেন। অবশেষে ১০০০ জন সৈন্য নিয়ে রাসুল স: যুদ্ধের জন্য রওনা হয়। মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর ৩০০ জন সঙ্গী নিয়ে যুদ্ধ থেকে ফিরে গেলেন এতে অনেকের মনে ভয় প্রবেশ করে। বাকী ৭০০ জন সাহাবী নিয়ে রাসুল স: এগিয়ে যান। যুদ্ধের ময়দানে রাসুল স: ৫০ জনের একটি তীরন্দাজ বাহিনী গঠন করে একটি গিরিপথে তাদের নিয়োগ করা হলো এবং বললেন তোমরা কোন অবস্থায়

এই স্থান ত্যাগ করবে না। এরপর চারদিকে যুদ্ধের দানাবল ছড়িয়ে পড়লো। যুদ্ধে মুসলমানদের সাহসীকতা ও অনেক কাফেরের মৃত্যুর কারনে মুশরিকদের মনবল ভেঙ্গে যায়। তারা পিছু হটতে শুরু করে। এরপর রাসুল স: যেই ৫০ জন তীরন্দাজ নিয়োগ করেছেন এবং তাদেরকে স্থান ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন তারা রাসুল স: এর নিষেধ ভুলে গিয়ে তারা সম্পূর্ণ বিজয় আসার পূর্বে স্থান ত্যাগ করে গনিমতের জন্য চলে যায়। এতে ঐ পথে কাফেরারা আক্রমণ শুরু করে এবং অনেক সাহাবী শহিদ হয়। এরমধ্যে রাসুল স: শহিদ হয়েছে বলে মিথ্যা খবর প্রচার হয়ে এতে যুদ্ধ অনেকটা থেমে যায়।মুলত মুশরিকদের আক্রমণে মহানবী সা এর ডানদিকের রুবাঈ দাত ভেঙ্গে গিয়েছিল। তার নিচের ঠোঁটটি আহত হয়েছিলো।এরপর রাসুল স: এর নির্দেশে সাহাবীরা পাহাড়ে আশ্রয় নেওয়া শুরু করে। কাফেরেরা তাদের হামলা করার জন্য পাহাড়ের দিকে যায় কিন্তু একদল মুজাহিদ তাদেরকে আক্রমণ করে নিচে নামতে বাধ্য করে।

খন্দকের যুদ্ধ

ওহুদের যুদ্ধের পর ছোট ছোট অনেক যুদ্ধ হয় এতে দিন দিন মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং কাফেরদের হিংসা বাড়তে থাকে তাই তারা পরিকল্পনা করে মুসলমানদের চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিবে। অল্পদিনের মধ্যে ১০ হাজাত সৈন্যের বিরাট বাহিনী মদিনার পাশে সমাবেত হল। এই খবর শুনে রাসুল স: মজলিসে শুরার বৈঠক ডাকেন। বৈঠকে সালমান ফারসির মত গৃহীত হয় যে যুদ্ধের স্থানের চারদিকে পরিখা খনন করতে হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিখা খনন শুরু হয়, রাসুল স: নিজেও এই কাজে অংশ নেন। পরিখা খননের কারনে মুখামুখি সংঘর্ষ হয়নি। দুই দলের মধ্যে তীর নিক্ষেপ হয়েছে এতে উভয় দলের সামান্য কয়েকজন মারা যায়। দীর্ঘ এক মাসের কাছাকাছি সময় একদল অন্য দলের বিভিন্ন ভাবে মনোবল নষ্ট করার চেষ্টা করেছে। এতে কাফেরদের মনোবল অধিক নষ্ট হয়ে যায় এবং তারা স্থান ত্যাগ করে চলে যায়।

ইফকের ঘটনা

রাসুল স: কোথাও সফরে যাওয়ার সময় স্ত্রীদের নাম লিখে লটারি করতেন যার নাম উঠতো তাকে নিয়ে যেতেন। বনু মুস্তালিকের সামরিক অভিযানে যাওয়ার সময় আয়েশা রা: এর নাম উঠে তাকে নিয়ে সফরে যায়। সফর থেকে ফিরার পথে যা স্থানে যাত্রা বিরতি হয় সেখানে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে আয়েশা রা: তার গলার হার হারিয়ে ফেলেন। হারটি খুজতে গেলে বাকিরা যাত্রা শুরু করেন। যারা আয়েশা রা: এর হাওদাজ উটের পিঠে

রেখেছেন তারা মনে করেছিল তার ভিতরে আয়েশা রা: আছেন। কারন আয়েশা রা: ছিলেন হালকা পাতলা। আয়েশা রা: ফিরে এসে দেখেন সবাই চলে গেছেন। তাই তিনি সেখানে শুয়ে পড়লেন ভাবলেন তারা তাকে না পেয়ে খুজতে আসবেন। সেই স্থান দিয়ে সফওয়ান রা: আগমন করলেন আয়েশা রা: তাকে চিনতে পারে এবং তার উটের পিঠে করে রওনা করেন। তাদেরকে এভাবে আসতে দেখে মুনাফিকরা নানা অপবাদ রটাতে শুরু করে। রাসুল স: চুপচাপ ছিলেন, দীর্ঘদিন অহি না আসায় রাসুল স: তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে সাহাবিদের সাথে আলোচনা করেন। এদিকে সফর থেকে এসে আয়েশা রা: অসুস্থ হয়ে পড়েন তার অপবাদের ব্যাপারে কিছু জানতেন না কিন্তু তিনি অনুমান করেছে অন্য সময় অসুস্থ হলে রাসুল স: যে রকম সেবা করতেন এখন সে রকম করছেন না। তাই সবকিছু ভালো ভাবে অবগত হওয়ার জন্য তার আব্বা আম্মার বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। তাকে অনুমতি দেওয়া হলে তিনি বাড়িতে গিয়ে সব জানতে পারলেন। সব শুনে তিনি শুধু কাদলেন তখন তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তার পিতা মাতা বললেন আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। এরপর আল্লাহ তায়ালা তাকে নির্দোষ করে আয়াত নাজিল করলেন। যারা আয়েশা রা: ব্যাপারে অপবাদ দিয়েছে তাদেরকে ৮০টি করে বেত্রাঘাত করা হয়েছে।

হুদায়বিয়ার সন্ধি

আরবের পরিস্থিতি মুসলমানদের অনুকূলে এসে গিয়েছিল। ষষ্ঠ হিজরিতে রাসুল স: ১৫০০ জন সাহাবী নিয়ে ওমরা পালন করার জন্য মক্কায় রওনা করেন। রাসুল স: ঘোষণা দিলেন আমরা ওমরার জন্য যাবো কোন যুদ্ধ নয় তবে কেউ যদি আমাদেরকে বাধা দেয় তাদেরকে প্রতিহত করা হবে। এদিকে কাফেরেরা বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিলেন মুসলমানদেরকে বাধা প্রদান করবে। তারা সিদ্ধান্ত নিল মুসলমানরা সালাতে দাড়ালো আক্রমণ করতে সহজ হবে তাই আল্লাহ তায়ালা সালাতুল খাওফ এর হুকুম দিলেন এতে তারা আক্রমণ করতে পারলোনা। এরপর ওসমান রা: কে কোরাইশদের কাছে পাঠালেন এবং তাদের আগমনের উদ্দেশ্য বলতে বললেন। ওসমান রা: তাদের কাছে গেলেন এবং কথা বললেন। কোরাইশরা ওসমান রা: কে তাদের কাছে রেখে দিলেন। দীর্ঘসময় ওসমান রা: ফিরে না আসায় গুজব ছড়িয়ে পড়লো তাকে হত্যা করা হয়েছে। তাই রাসুল স: বললেন কোরাইশদের সাথে লড়াই না করে আমরা স্থান ত্যাগ করবো না। এরপর সাহাবিদের থেকে বায়াত নিলেন তারা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালাবে না। বায়েত শেষে ওসমান রা: এসে উপস্থিত হলেন। কোরাইশরা অবস্থা নাজুক দেখে সোহায়েল ইবনে আমরকে সন্ধি করতে পাঠালেন। তার

সাথে আলোচনা করে কিছু শর্তে সন্ধিতে চুক্তিবদ্ধ হলেন। শর্তগুলো হলো ১। এই বছর ফিরে যাবে আগামী বছর তারা আসবে। ২। দশ বছর যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। ৩। যার যার ধর্ম পালন করবে কাউকে জোড় করা যাবেনা। ৪। কোরাইশদের কেউ আসলে ফিরিয়ে দিতে হবে কিন্তু মুসলিমদের কেউ তাদের কাছে গেলে ফেরত দেওয়া হবেনা। তখন মুসলমানরা ওমরাহ সমাপ্ত ভেবে কোরবানি এবং মাথামুণ্ডন করে ফিরে গেলেন।

খায়বর যুদ্ধ

হুদায়বিয়ার সন্ধির অল্প কিছু দিন পরে কাফেররা তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলমানদের একটি কাফেলার উপর হামলা করে। এতে দুই দলের মধ্যে খায়বর যুদ্ধ সংগঠিত হয়। উভয় দল খায়বরে পৌছালেন, রাসুল স: বলেন আমি আগামীকাল এমন একজনের পতাকা প্রদান করবো যে আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসুলকে ভালোবাসেন। সাহাবীরা সকলে পতাকা পাওয়ার আসায় রইল। সকাল বেলা রাসুল স: বললেন আলী রা: কোথায়? সাহাবীরা বলল তার চোখ উঠেছে, তারপর তাকে আনা হলো রাসুল স: তার চোখে থুথু লাগালেন এতে তার চোখ ভালো হয়ে যায়। আলী রা: মুসলিম সৈন্যদের সাথে নিয়ে ইহুদিদের ইসলামের দাওয়াত দেন তারা দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে মুসলমানদের মুখামুখি দাঁড়ায়। এবং যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে কাফেরদের আটটি দুর্গ ছিল মুসলমানরা সবগুলো দুর্গ ভেঙে দিলেন। তারপর কাফেরেরা সকল সম্পত্তি দেওয়ার শর্তে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করলে রাসুল স: সন্ধি মেনে নিলেন এবং মুসলমানদের চূড়ান্ত জয় হয়।

রাসুল স: কে বিষ মিশ্রিত মাংস খাওয়ানোর ঘটনা

খায়বর বিজয়ের পর সালাম ইবনে মুশকিম এর স্ত্রী যয়নব বিনতে হারেছ রাসুল স: কে বকরির ভুনা মাংস উপঢৌকন হিসাবে প্রেরণ করে। তার কিছু অংশ রাসুল স: মুখে নিয়ে চিবিয়ে ফেলে দেন এবং বলেন এই হাড় আমাকে বলছে এতে বিষ মিশানো হয়েছে। যয়নব কে জিজ্ঞাসা করলে সে স্বীকার করে। তুমি কেন এই কাজ করেছো বলা হলে সে বলে আমি ভাবছিলাম এই ব্যক্তি নবী হলে আমার বিষ মিশানোর খবর তাকে জানানো হবে। এই কথা শুনে রাসুল স: তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু রাসুল স: এর সাথে তার সাহাবী বাশার ইবনে বারা রা: ছিলেন তিনি মারা গেলেন তাই ঐ মহিলাকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়।

মুতার যুদ্ধ

রাসুল স: এর জীবিত অবস্থায় যেসকল যুদ্ধ হয় সেসবের মধ্যে মুতার যুদ্ধ ছিল সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী। ৮ম হিজরিতে এই যুদ্ধ সংগঠিত হয়। রাসুল স: হারেছ রা: কে বসরায় গভর্নর এর নিকট চিঠিসহ পাঠান কিন্তু তারা তাকে হত্যা করে তাই রাসুল স: তিন হাজার সৈন্য প্রস্তুত করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। এই যুদ্ধে তিনজনকে সেনাপতির দায়িত্ব দেন যায়েদ ইবনে হারেছ রা:, জাফর রা: ও আব্দুল্লাহ ইবনে রাওহা রা:। সৈন্যদলকে রাসুল স: বলেন তোমরা হারেছ রা: এর হত্যাকাণ্ডের স্থানে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে লড়াই করবে। এই যুদ্ধে দুই লক্ষ কাফেরদের বিরুদ্ধে মাত্র তিন হাজার মুসলমান যুদ্ধ করে। যুদ্ধ চলাকালে এক এক করে তিনজন সেনাপতি শহিদ হওয়ার পরে সাহাবারা খালেদ ইবনে ওলীদ রা: কে সেনাপতির দায়িত্ব দেন। তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। খালেদ ইবনে ওলীদ রা: এর নয়টি তরবারি ভেঙে যায় এবং তিনি ছোট একটা তরবারি দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যান। পরের দিন খালেদ ইবনে ওলীদ রা: কৌশল করে মুসলিমদের পিছনে নিয়ে গেলেন এবং কাফেরেরা ফিরে গেলেন।

মক্কা বিজয়

কোরাইশরা হুদাবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে কিছু মুসলিমকে হত্যা করেছে। পুনরায় সন্ধি করার চেষ্টা করার জন্য আবু সুফিয়ান মদিনায় আসে কিন্তু তিনি কারো কাছে ঠাই পায়নি। ৮ম হিজরিতে রাসুল স: মক্কা অভিমুখে দশ হাজার সাহাবী নিয়ে রওনা হলেন। মক্কায় পৌছানের পূর্বে কোরাইশদের অনেকে রাসুল স: এর নিকট নিজেদের নিরাপত্তার আবেদন করেন। আব্বাস রা: আবু সুফিয়ান কে রাসুল স: নিকট নিয়ে আসেন। ওমর রা: তাকে হত্যা করতে চাইলেও অনুমতি দেওয়া হয়নি। অবশেষে আবু সুফিয়ান ইসলাম কবুল করেন। আবু সুফিয়ান রা: মক্কায় প্রবেশ করে উচ্চ কণ্ঠে বলল, মুহাম্মদ স: এত সৈন্য নিয়ে এসেছে যে তাদের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। আজ যারা আবু সুফিয়ান এর ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। এই কথা সুনে তার স্ত্রী হিন্দা বলল তোমারা এই বুড়াকে মেরে ফেল। আবু সুফিয়ান রা: বললেন তোমার সর্বনাশ হোক। আরো বলেন যারা মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে তারা নিরাপদ। রাসুল স: মক্কার বিভিন্ন প্রবেশ পথে বিভিন্ন বাহিনী প্রেরন করেন। খালেদ ইবনে ওলীদ ও তার সাথীদের যাত্রা পথে যারা বাধা দিয়েছিল তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে ১২ জন মুশরিক নিহত হয় এতে কোরাইশরা আতংকিত হয়ে পড়ে। এরপর রাসুল স: কাবা ঘরে প্রবেশ করে হাযরে আসওয়াদ চুম্বন করে তারপর তাওয়াফ করে এরপর ৩৬০ টি মূর্তি ভেঙ্গে দিলেন। এরপর কাবা ঘরে নামায আদায়

করেন। এরপর সকলের উদ্দেশ্যে ভাষন দেন। তিনি বলেন আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। কিন্তু তিনি নয়জন চিহ্নিত অপরাধীকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। অপরাধীদের যারা ইসলাম কবুল করেন তাদের প্রানভিক্ষা দেওয়া হয়। যারা ইসলাম কবুল করেন নাই তাদের হত্যা করা হয়েছে।

বিদায় হজ

মক্কা বিজয়ের পর দাওয়াত ও বিভিন্ন অভিযানের ফলে ইসলামের কাজের পূর্নতা হয়েছে। রাসুল স: দশম হিজরিরতে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মানুষের সামনে এক ঐতিহাসিক ভাষন দেন। তিনি বলেন-

১.

أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنِّى وَاللهِ لاَ أَدْرِى لَعَلِّى لاَ أَلْقَاكُمْ بَعْدَ يَوْمِى هَذَا بِمَكَانِى هَذَا، فَرَحِمَ اللهُ مَنْ سَمِعَ مَقَالَتِى الْيَوْمَ فَوَعَاهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ وَلاَ فِقْهَ لَهُ، وَلَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ

২.

وَاعْلَمُوا أَنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ هَذَا الْيَوْمِ فِى هَذَا الشَّهْرِ فِى هَذَا الْبَلَدِ

৩.

وَاعْلَمُوا أَنَّ الْقُلُوبَ لاَ تَغِلُّ عَلَى ثَلاَثٍ: إِخْلاَصِ الْعَمَلِ لِلّهِ، وَمُنَاصَحَةِ أُولِى الأَمْرِ، وَعَلَى لُزُومِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ

৪.

-أَلاَ كُلُّ شَىْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَىَّ مَوْضُوْعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ

৫.

وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوْعٌ كُلُّهُ-

৬.

فَإِنَّهُ مَوْضُوْعٌ كُلُّهُ- فَاتَّقُوا اللهَ فِى النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ

৭.

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ

৮.

وَأَنْتُمْ تُسْأَلُوْنَ عَنِّىْ فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُوْنَ- قَالُوْا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلىَ السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ، اللهُمَّ اشْهَدْ، اللهُمَّ اشْهَدْ- ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

৯.

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ؟ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِى طَاعَةِ اللهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ

১০.

أَلاَ وَإِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَأُكَاثِرُ بِكُمُ الأُمَمَ فَلاَ تُسَوِّدُوا وَجْهِى

১১.

أَلاَ وَإِنِّى مُسْتَنْقِذٌ أُنَاسًا وَمُسْتَنْقَذٌ مِنِّى أُنَاسٌ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُصَيْحَابِى. فَيَقُولُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ-

১২.

إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِى كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً

১৩.

أَىُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ. قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِى بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلاَ لاَ يَجْنِى جَانٍ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ لاَ يَجْنِى وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُوْدٌ عَلَى وَالِدِهِ-

১৪.

أَلاَ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِى بِلاَدِكُمْ هَذِهِ أَبَدًا وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ-

১৫.

أَلاَ إِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ فَلَيْسَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ إِلاَّ مَا أَحَلَّ مِنْ نَفْسِه‘

(১) ‘হে জনগণ! আল্লাহর কসম, আমি জানিনা আজকের পরে আর কোনদিন তোমাদের সঙ্গে এই স্থানে মিলিত হ’তে পারব কি-না। অতএব আল্লাহ রহম করুন ঐ ব্যক্তির উপরে যে ব্যক্তি আজকে আমার কথা শুনবে ও তা স্মরণ রাখবে। কেননা অনেক জ্ঞানের বাহক নিজে জ্ঞানী নয় (সে অন্যের নিকট জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়) এবং অনেক জ্ঞানের বাহক তার চাইতে অধিকতর জ্ঞানীর নিকটে জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়।

(২) তোমাদের মাল-সম্পদ ও তোমাদের রক্ত তোমাদের পরস্পরের উপরে হারাম, যেমন আজকের এই দিন, এই মাস, এই শহর তোমাদের জন্য হারাম’

(৩) জেনে রেখ, তিনটি বিষয়ে মুমিনের অন্তর খিয়ানত করে না : (ক) আল্লাহর উদ্দেশ্যে এখলাছের সাথে কাজ করা। (খ) শাসকদের জন্য কল্যাণ কামনা করা এবং (গ) মুসলমানদের জামা‘আতকে আকড়ে ধরা।

(৪) ‘শুনে রাখ, জাহেলী যুগের সকল কিছু আমার পায়ের তলে পিষ্ট হ’ল। জাহেলী যুগের সকল রক্তের দাবী পরিত্যক্ত হ’ল।

(৫) 'জাহেলী যুগের সকল সূদ পরিত্যক্ত হ'ল। আমাদের সূদ সমূহের প্রথম যে সূদ আমি শেষ করে দিচ্ছি সেটি হ'ল (আমার চাচা) আববাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিবের পাওনা সূদ। যার সবটুকুই বাতিল করা হ'ল।

(৬) 'তোমরা নারীদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসাবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে তাদেরকে হালাল করেছ।

(৭) 'আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ তোমরা সে দু'টি জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হবে না- আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের হাদীস।

(৮) 'আর তোমরা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। তখন তোমরা কি বলবে? লোকেরা বলল, আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি সবকিছু পৌঁছে দিয়েছেন, (রিসালাতের আমানত) আদায় করেছেন এবং উপদেশ দিয়েছেন'। অতঃপর তিনি শাহাদাত অঙ্গুলী আসমানের দিকে উঁচু করে অতঃপর সমবেত জনমন্ডলীর দিকে নীচু করে বললেন, 'হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক' (তিনবার)

(৯) 'আমি কি তোমাদেরকে মুমিন সম্পর্কে খবর দিব না? সে ঐ ব্যক্তি যার হাত থেকে অন্যদের মাল ও জান নিরাপদ থাকে। আর মুসলিম সেই, যার জবান ও হাত থেকে অন্যেরা নিরাপদ থাকে। আর মুজাহিদ সেই, যে আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে সর্বাত্মকভাবে নিয়োজিত করে এবং মুহাজির সেই, যে সকল প্রকার অন্যায় ও পাপকর্ম সমূহ পরিত্যাগ করে।

(১০) 'মনে রেখ! আমি তোমাদের সকলের আগেই হাউয কাউছারে পৌঁছে যাব। আর আমি অন্য সকল উম্মতের মধ্যে তোমাদের আধিক্য নিয়ে গর্ব করব। অতএব তোমরা আমার চেহারাকে কালেমালিপ্ত করো না।

(১১) মনে রেখ! আমি অনেককে সেদিন মুক্ত করব এবং অনেকে সেদিন আমার থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তখন আমি বলব, 'হে আমার প্রতিপালক! এরা তো আমার সাথী। তিনি বলবেন, তুমি জানো না তোমার পরে এরা (ইসলামের মধ্যে) কত বিদ'আত সৃষ্টি করেছিল'

(১২) হে জনগণ! নিশ্চয় প্রত্যেক পরিবারের উপর প্রতি বছর একটি করে পশু কুরবানী ফরয।

(১৩) 'আজকে কোন দিন? লোকেরা বলল, হাজ্জে আকবারের দিন। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান পরস্পরের জন্য হারাম। যেমন এই দিন ও এই শহর তোমাদের জন্য হারাম। 'মনে রেখ, অপরাধের শাস্তি অপরাধী ব্যতীত অন্যের উপরে বর্তাবে না। পিতার অপরাধের শাস্তি পুত্রের উপর এবং পুত্রের অপরাধের শাস্তি পিতার উপর বর্তাবে না'।

(১৪) ‘‘মনে রেখ, শয়তান তোমাদের এই শহরে পূজা পাওয়া থেকে (অর্থাৎ তোমাদের কাফের হওয়া থেকে) চিরদিনের মত নিরাশ হয়ে গেছে। তবে যেসব কাজগুলিকে তোমরা তুচ্ছ মনে কর, সেসব কাজে তার আনুগত্য করা হবে, আর তাতেই সে খুশী থাকবে।
(১৫) ‘মনে রেখ! এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই। অতএব কোন মুসলমানের জন্য তার ভাই-এর কোন বস্তু হালাল নয় কেবল অতটুকু ব্যতীত যতটুকু সে তার জন্য হালাল করে

রাসুল স: এর মৃত্যু

বিদায় হজের ভাষন এর পরে পবিত্র কুরআনের শেষ আয়াত নাযিল, সুরা মায়েদা আয়াত নং-৩, মৃত্যুর ০৭দিন পূর্বে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মৃত্যুর ০৫ দিন পূর্বে অসুস্থতা বৃদ্ধি পেল এবং তার মাথায় পানি দেওয়া হলো। তিনি কিছুটা সুস্থ অনুভব করলে মসজিদে গমন করেন এবং কিছু ভাষন দেন। তিনি বলেন তোমরা আমার কবরকে পুজা করার উদ্দেশ্য মূর্তিতে পরিনত করোনা। এরপর সকলের উদ্দেশ্যে বললেন আমি কাউকে আঘাত করলে সে যেন বদলা নিয়ে নেয়, কাউকে অসম্মান করলে বদলা নিয়ে নেয়। মৃত্যুর চার দিন পূর্বে অধিক অসুস্থতার কারনে আবু বকর রা: কে নামাযের ইমামতি করার জন্য আদেশ করেন। মৃত্যুর দুই দিন পূর্বে কিছুটা সুস্থ অনুভব হলে তিনি দুজন লোকের কাধে ভর করে মসজিদে যান, তাকে দেখে আবু বকর রা: পিছনে সরে আসতে চাইলে তিনি ইশারায় নিষেধ করেন। মৃত্যুর আগের দিন তিনি তার সকল দাস দাসীকে মুক্ত করে দিলেন এবং মাত্র সাত দিনার ছিল তা তিনি সদকা করে দিলেন। অবশেষে ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার মুসলমানরা ফজরের সালাত আদায় করতেছে এমন সময় আয়েশা রা: হুজরার পর্দা সরালে রাসুল স: মৃদু হাসলেন। এরপর চাশত সালাতের সময় ফাতেমা রা: এর সাথে কথা বললেন। এরপর সাহাবিদের উদ্দেশ্যে বলেন আস সালাত, আস সালাত অমা মালাকাত আইমানুকুম। এরপর রাসুল স: মেসওয়াক করলেন কিছু দোয়া পড়লেন। অবশেষে তিনি পরম প্রিয়ের সান্নিধ্যে চলে গেলেন।

শোকের ছায়া

মদিনার জনগন শোকে অভিভুত হয়ে গেলেন। আবু বকর রা: নিজ গৃহ থেকে খবর শুনা মাত্র ছুটে এলেন এবং রাসুল স: এর চেহারায় চুম্বন করলেন। আর ওমর রা: সমাবেত লোকদের সাথে কথা বলছিলেন। আবু বকর রা: তাকে বসতে বললেন তিনি বসলেল না।

তখন আবু বকর রা: বললেন যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের পুজা করতো সে যেন জেনে রাখে মুহাম্মদ স: ইনতেকাল করেছে, আর যে আল্লাহর ইবাদাত করে সে যেন জেনে রাখে আল্লাহ চিরঞ্জীব, পরের দিন মঙ্গলবার রাসুল স: কে গোসল দিলেন। গোসলের পরে তাকে তিন খানা চাদর দিয়ে কাফন প্রদান করা হয়। এরপর সাহাবিরা ব্যক্তিগত ভাবে তার জানাযা আদায় করেন কারন এই নামাযে কেউ ইমাম হননি। এরপর মঙ্গলবার রাতে তাকে রাসুল স: যেই বিছানায় মৃত্যু বরন করে সেখানে তাকে দাফন করা হয়।